হায়দারাবাদ ট্রাজেডী

ও

আজকের বাংলাদেশ

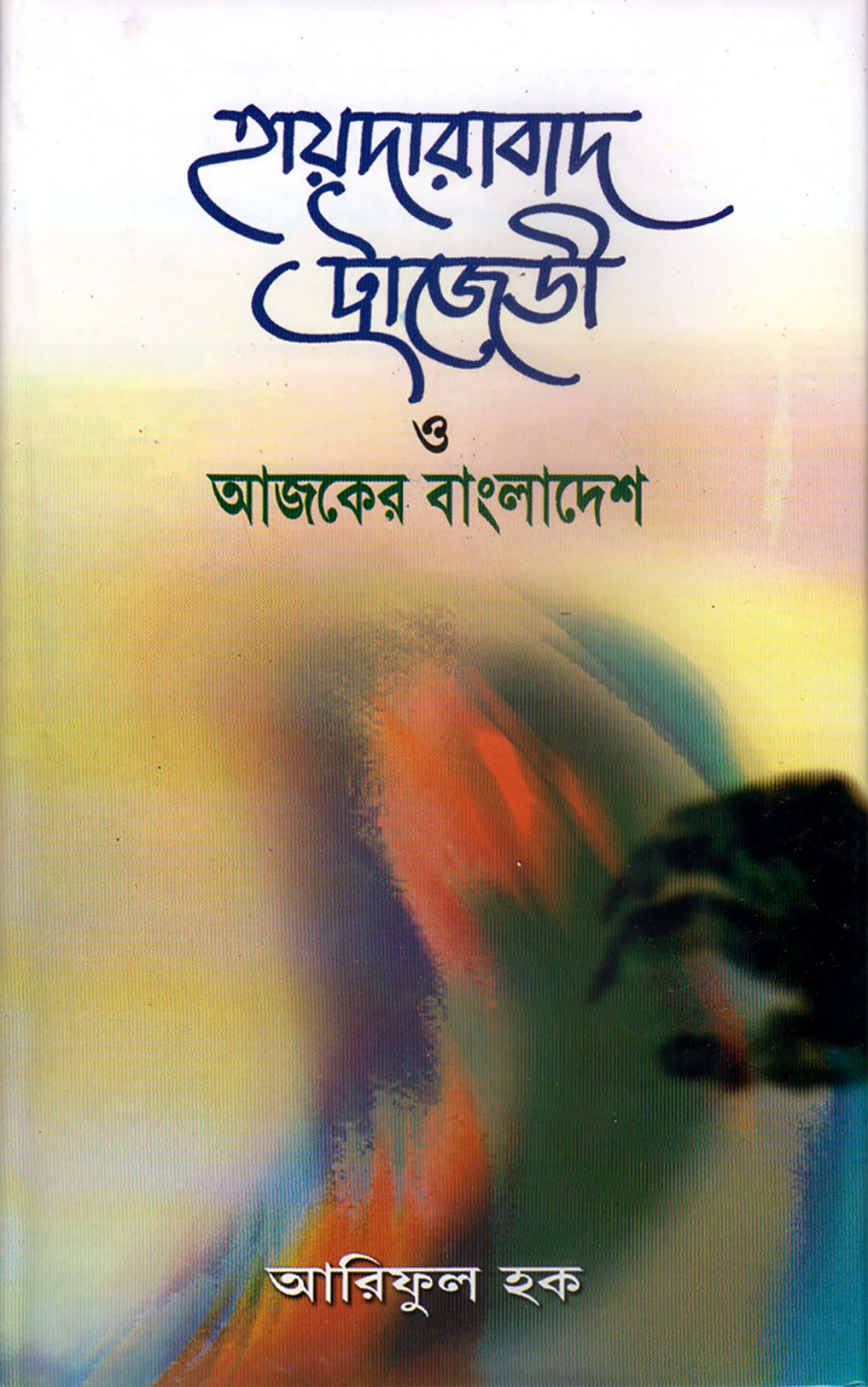

আরিফুল হক

হায়দারাবাদ ট্র্যাজেডি
ও
আজকের বাংলাদেশ

আরিফুল হক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম, ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদ ট্র্যাজেডি

ও

আজকের বাংলাদেশ

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন : ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০১
২য় সংস্করণ : অক্টোবর - ২০১৬
২য় সংস্করণের প্রথম পুনর্মুদ্রণ : জুলাই - ২০১৯

মুদ্রণে
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪, ৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ অলংকরণ
আরিফুর রহমান

মূল্য
৮০.০০ (আশি) টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন : ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৯৫৭৪৫৯০

Hydarabad Tragedy, By: Ariful Haq, Published by: S. M. Raisuddin Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. E-mail : booksocietyltd@yahoo.com
Price : Tk. 80.00, US$ 3.00 **ISBN. 984-493-050-2**

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

আমার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বই-পুস্তক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি গোছগাছ করেই যিনি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, সেই প্রিয়তমা স্ত্রী মেহেরুন নিসা আরিফকে।

আরিফুল হক

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

হিন্দু প্রবচনের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-"শতং বদ ম লিখ।" অর্থাৎ শতবার বলো কিন্তু লিখোনা। কারণ লিখলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এ শ্লোকটির যথার্থতা প্রমাণ মেলে তাদের কথায়, চিন্তায় ও কর্মে। এরা যা বলে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন ধারা চুক্তিতে লিখেন না। আর প্রতিপক্ষ যদি দুর্বল হয় তো কথাই নেই। চুক্তির দশভাগও বাস্তবায়িত হয় না।

অথচ ইসলামে তাগিদ রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে লিখে রাখার। এখানেই অন্য ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের স্বাতন্ত্রতা পরিস্ফুটিত।

ইসলাম প্রাক-যুগে এ পৃথিবীতে কোন রীতিনীতি ছিল না। জোর যার মুল্লুক তার-এই ছিল নীতি। এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে সামান্য ঠুনকো অজুহাতে স্বদেশ থেকে উৎখাত করতো। সবলেরা দুর্বলের উপর নানা বাহানায়, নানা কৌশলে অত্যাচার চালাতো। এই সব অন্যায়-অবিচার রহিত করার স্বার্থেই ইসলাম ধর্ম লিখে রাখার বা পরস্পরের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক বিষয়ে চুক্তি করার তাগিদ দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলামের বিজয় মুহূর্তে অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের মদিনা সনদ নামে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এটাই ছিল পৃথিবীতে প্রথম লিখিত চুক্তি বা সংবিধান। পরবর্তীতে অমুসলিমরা সম্পাদিত চুক্তির যে সব ধারা তাদের স্বার্থের অনুকূলে সে সব ধারা মেনে চলতো। আর যে সব ধারা তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে সে সব ধারা লংঙ্ঘন করতো।

পবিত্র কোরআনে দু'টি আয়াত রয়েছে। এ আয়াতটি পড়লে মনে হয় ইহুদী-খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের লক্ষ্য করেই যেন আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন-"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে অংশীবাদীদের যুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। যতদিন তারা তোমাদের সাথে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকবে তোমরাও তাদের সাথে (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের ভালবাসেন।

কেমন করে থাকবে যখন তারা তোমাদের ওপর সুবিধা করতে না পারলে তোমাদের আত্মীয়তার বা অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দেয়না। তাদের মুখ তোমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের প্রতি বিরূপ। আর তাদের অধিকাংশই তো সত্যত্যাগী (সুরা তওবা, আয়াত ৭, ৮)

পবিত্র কোরআনের এই শ্বাশত বাণীর প্রতিফলন ঐতিহাসিক ও সমকালীন ঘটনায় রয়েছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বরূপ সম্পর্কে মহাত্মাকেরীর একটি উক্তি থেকেই পরিস্ফুট হবে। তিনি বলেছেন ....."একথা সত্য যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মত তারা হিংস্র নয়। কিন্তু নীচু, চতুরতা ও শঠতায় তারা এ অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছে।"

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশসমূহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করাই হচ্ছে ভারতীয় কূটনীতির মূল স্তম্ভ। প্রাচীন হিন্দু রাজা এবং শাসকদের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক উপদেষ্টা কৌটিল্যের কাছে মেকিয়াভেলীর কূটকৌশলও ম্লান হয়ে যায়। এহেন কৌটিল্য

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃক হিন্দু রাজা ও শাসকগণকে প্রদত্ত রাজনৈতিক বিষয়ে উপদেশগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপঃ (ক) ক্ষমতা অর্জনের লোভ এবং অন্য দেশ বিজয়ের আকাঙ্খাকে কখনো মন থেকে মুছে যেতে দেবে না। (খ) সকল সীমান্তবর্তী রাজ্যকে শত্রু মনে করতে হবে। (গ) প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। (ঘ) সারা পৃথিবী চাইলেও তুমি নিজে শান্তির কথা চিন্তা করতে পারবে না। তবে বাহ্যিকভাবে শান্তি এবং সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের ভান করে নিজের আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার অভিপ্রায়ে একে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করা যাবে।

উপরোক্ত দর্শনের বিষময় ফল ভারত স্বাধীনতার ৫৪ বছরে উপমহাদেশের প্রতিবেশীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঙ্ঘন করে স্বাধীন রাজের জুনাগড়, মানভাদার ও হায়দারাবাদকে জোর করে ভারতের পেটের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ১৯৪৭ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, "গণভোটের যে শর্তে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ভারত সরকার অবশ্যই সেই শর্ত পূরণ করবে।" এর আগে ১৯৪৭ সালের ৩১ অক্টোবর পন্ডিত নেহেরু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বলেছিলেন, 'আমাদের এই প্রতিশ্রুতি শুধু আপনার সরকারের কাছে প্রদত্ত ওয়াদা মাত্র নয়, বরঞ্চ এটা কাশ্মীরের জনসাধারণ এবং সেটা দুনিয়ার প্রতি আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।'

কিন্তু এরপর ৫৪ বছর চলছে কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। ভারত জাতিসংঘ প্রস্তাব এবং তাদের নিজেদের প্রদত্ত ওয়াদা অনুযায়ী কাশ্মীরে গণভোটের ব্যবস্থা করা তো দুরে থাক, বরং জুলুম, নির্যাতন, সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদির মাধ্যমে কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলামানদের স্বাধীনতার দাবীকে চিরতরে মিটিয়ে দেবার হীন তৎপরতায় লিপ্ত।

আরিফুল হক সাহেবের 'হায়দারাবাদ ট্র্যাজেডি ও আজকের বাংলাদেশ' নামক পান্ডুলিপিটা পড়ে যে কোন মুসলমান ব্যথিত, আতঙ্কিত, আশঙ্কিত হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। বইটি নিছক "পড়ার জন্য পড়া" একটি বই নয়। এর ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতা, মুসলমানদের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ ও সচেতন করার উপযোগিতা রয়েছে। চলমান ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন ক্ষেত্রেও এই ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত বইটি আবেদন রাখবে। সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় আচরণ ভারত সম্পর্কে এদেশের মানুষকে নতুনভাবে ভাবার অবকাশ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সময়ের দাবী মেটাতে ও এই সময়ের জনগণের কাছে যথেষ্ট উপযোগী হবে মনে করে উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রকাশনার আঞ্জাম দিয়ে এক ঐতিহাসিক জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছে। ১ম সংস্করণ ও ২য় সংস্করণের মুদ্রিত কপি শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং পাঠকের চাহিদা থাকায় ২য় সংস্করণের প্রথম পুনর্মুদ্রণ করা হলো। আমি বিশ্বাস করি, বইটির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

আমি ইতিহাসবিদ নই। ইতিহাস নিয়ে লেখালেখিরও কোন অধিকার আমার আছে বলে মনে করি না। তারপরও সময়ের প্রয়োজনে কাজটা করতে হচ্ছে। কারণ যাঁদের করার কথা ছিল, তারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন, নয়তো সত্য কথাটা নির্ভয়ে বলতে পারছেন না। সত্যের সাথে পরিচয় না হলে কোন জাতির উদ্ধার সম্ভব নয়। কাজেই সত্যানুসন্ধানে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হবে।

আলোচ্য বইটি আমার নিত্যদিনের উপলব্ধির ফসল। সুদীর্ঘ জীবনে যা দেখেছি-বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছি, অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিক বলে জেনেছি, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সে কথাই আবেগশূন্য হয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছি। কোন যুগ, সময়, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

ইতিহাস কেবল অতীত নয়, এক কথায় আমাদের ভবিষ্যতও। খনন কার্য্য চালিয়ে বিলুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করে যতই স্ব-স্থানে স্থাপন করা যাবে, ততই জাতির আত্মার রূপরেখা নির্মাণের কাজটি সহজতর হবে।

হায়দারাবাদ হারিয়ে যাওয়া কোন অতীত নয়, মুছে ফেলা কোন দেয়ালের লিখন নয়, ফেলে দেয়া কোন পুরানো ক্যালেন্ডারের পাতা নয়। হায়দারাবাদ আমাদের জন্য জীবন্ত ইস্তেহার, ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা, পথচলার মাইলফলক, জাতীয় জীবনের শিক্ষণীয় ইতিহাস। হায়দারাবাদের করুণ পরিণতি আমাদের অনেক কিছু বলতে চায়, অনেক কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করে, তাইতো অর্দ্ধশতাব্দী পরে হায়দারাবাদের ইতিহাস আমাদের সামনে ফিরে ফিরে আসছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ এই উপমহাদেশের শক্ হুন, পাঠান, মোগলকে এক দেহে লীন করতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহেরু স্বপ্ন দেখতেন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সমস্ত এলাকা একদিন ভারতের একচ্ছত্র দখলে চলে আসবে। তখন স্বাধীন রাষ্ট্র সত্তা নিয়ে কোন সংখ্যালঘু জাতি টিকে থাকবে না। গান্ধী ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিকে অভিন্ন বলে চালাতে চেয়েছিলেন। রবার্ট বায়রণ তাঁর 'দি ষ্ট্রেটসম্যান অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, "বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছেন, এই উপমহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হল বিদেশী দখলদার,

www.nagorikpathagar.org

কাজেই তাদের শারীরিকভাবেই নির্মূল করতে হবে"। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী বলেছিলেন-"কংগ্রেস অথবা সমগ্র ভারতীয় জাতি কখনই অখন্ড ভারতের দাবী পরিত্যাগ করবে না।" ভারতের প্রথম উপপ্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলতেন, আজ হোক কাল হোক আমরা আবার এক হব এবং বৃহৎ ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাব।" গান্ধী ও অন্যান্য হিন্দু নেতা সম্পর্কে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেছিলেন, "গ্রেট ব্রিটেন ভারত শাসন করতে চায়। মিঃ গান্ধী ও তাঁর-কংগ্রেস, মুসলমানদের শাসন করতে চায়। আমরা বলি বৃটিশ অথবা মিঃ গান্ধীকে মুসলমানদের উপর শাসন করতে দেব না।" চরিত্রগত ভাবেই ভারত তার আশপাশের কোন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে, সর্বভারতীয় হিন্দু নেতা সাভারকর এক বাণীতে বলেছিলেন -"প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গে একটা হিন্দু প্রদেশ গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যে কোন মূল্যে আসাম থেকে মুসলিম (অনধিকার প্রবেশকারীদের) বিতাড়ন করে, এই দু'টি হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানকে পিষে মারতে হবে।" সেই হিন্দু মহাসভার অঙ্গদল বিজেপি এখন ভারতের ক্ষমতার শিখরে। তারা ১৯৪৭ সালে মুসলিম প্রধান বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ গঠন করেছে। ১৯৪৭ থেকে '৮৫-এর মধ্যে আসাম থেকে মুসলমান বিতাড়ন প্রক্রিয়াও শেষ করেছে। পূর্ব পাকিস্তান নামটিও মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এখন পিষে ফেলতে বাকি রয়ে গেছে বাংলাদেশ। তারই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। এই সময় হায়দারাবাদের দৃষ্টান্ত আমাদের সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দেবে বলে বিশ্বাস করি।

হায়দারাবাদের জনসংখ্যার ৮৮.৬ ভাগ হিন্দু এবং ১০.৪ ভাগ মাত্র মুসলমান ছিল, ফলে হায়দারাবাদে হিন্দু ভারতের আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮৮.৫ ভাগ মুসলমান এবং অবশিষ্ট ১১.৫ ভাগ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান জনগোষ্ঠী। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিণতি হায়দারাবাদের মত হবে না বলে যারা মনে করেন, তাদের হয়তো জানা নেই যে, ৮৮.৫ ভাগ মুসলমানদের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকেও যদি বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামী দেহধারী, মানবগোষ্ঠী অর্থাৎ শুধু মুসলমান নামধারী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে তো উদ্দেশ্য সাধনে, অসফল হওয়ার কোন

www.nagorikpathagar.org

কারণ থাকতে পারে না। বাংলাদেশে সেই প্রক্রিয়াই শুরু করা হয়েছে।

ইতিহাসের ধারাক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এদেশের মুসলমানরা দীর্ঘ ২১৪ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করে এসেছে সেই লড়াই-এর সবটুকুই ছিল তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। ভারতের বহু ঈশ্বরবাদ, সামাজিক বৈষম্য, ব্রাহ্মণদের জন্য একমুখী ন্যায় ও কল্যাণের দর্শনের সংগে মুসলমানদের একেশ্বরবাদ, সাম্য সামাজিক সুবিচার, ন্যায় ও কল্যাণ বোধের জীবন ব্যবস্থার কোন মিল ছিল না বলেই পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। হিন্দু আর্য্য সভ্যতার সামাজিক ভিত্তি ছিল বংশানুক্রমিক বর্ণ বৈষম্য, গোব্রাহ্মণে বিশেষ ভক্তি এবং মুসলিম সভ্যতার ভিত্তি হল সাম্য এবং মানব সমতা। অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক। এই পার্থক্য রক্তের, মনমানসের, ধর্ম-কর্মের, নাম-নিশানার, এবাদত-বন্দেগীর, খাদ্য-খাবারের, পোষাক- পরিচ্ছদের, আইন-কানুনের, জীবনবোধের, জীবন-যাপনের এবং জীবন-সাধনার। এ পার্থক্য হাজার বছর আগেও যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। এই পার্থক্যের কারণেই মুসলমানরা হিন্দু ভারতে টিকে থাকতে পারেনি, স্বতন্ত্র আবাসভুমি গড়তে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান বিরোধকে ইসলাম বিরোধী হিসাবে প্রচার করা হল। পাকিস্তানের ২৪ বছরই শুধু নয়, মুসলিম আমলের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসকে শোষণের ইতিহাস বলে অগ্রাহ্য করা হল। বুদ্ধিজীবীরা বোঝাতে লাগলেন যে, মুসলিম ইতিহাসের সাথে সম্পর্ক রক্ষা হবে আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি। নিজেরা তুর্কী বা ফার্সী ভাষাভাষী হয়ে যাঁরা পরিত্যক্ত বাংলা ভাষাকে জাতে তুলেছিলেন, বর্গী, মগ, মারাঠাদের অত্যাচার থেকে যারা দেশকে বাঁচিয়েছিলেন, ইতিহাসের সেই বীর পুরুষরা হয়ে গেলেন উৎপীড়ক, আর যারা কলকাতায় বসে এদেশের উৎপাদিত ফসলের পয়সায়, এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের ঘামের দামে কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন, যারা বর্গী হয়ে, মাড়োয়ারী হয়ে, জমিদার হয়ে, যুগ যুগ ধরে এদেশের মুসলমানদের শোষণ করলেন, নির্যাতন করলেন, রাতারাতি তারাই হয়ে গেলেন আপনজন। এসব ঘটনা কি ইতিহাসের কোন অমোঘ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেনা? বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানুষকে সেই সত্য ভুলিয়ে দেয়া হল যে, ৪৭-এর স্বাধীনতা হয়েছিল বলেই ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার, অবহেলিত উপেক্ষিত ৪ কোটি নাঙ্গাভুখা মানুষ স্বাধীন জাতির গৌরব অর্জন করতে

www.nagorikpathagar.org

পেরেছিল। নির্জীব, পতিত জেলা শহর ঢাকা; ২০০ বছর পর আবার রাজধানীর সাজে ঝলমল করে উঠেছিল। দেশে সৃষ্টি হয়েছিল কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা, ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনেও মুসলমান ছেলেমেয়েদের অবাধ দৃপ্ত পদচারণা শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানদের আজ যেটুকু অর্জন তার সিংহভাগই ছিল ৪৭-এর স্বাধীনতার দান। সে কথা ভুলিয়ে দিয়ে রটনা করা হল ৪৭-এর স্বাধীনতা ভুল ছিল। কিছুদিন আগে কলকাতার মওলানা আজাদ ইনষ্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ এর উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল দেশভাগের ৫০ বছর পর এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর কি করা উচিত। সেখানে বাংলাদেশের মুখচেনা কিছু বুদ্ধিজীবী (যাদের জাতিগত পরিচয় মুসলমান) বলেছিলেন, উপমহাদেশের মানচিত্রে কোন রকম রদবদল না ঘটিয়ে দেশ বিভাগের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ আবার সেই শক হুন পাঠান মোগল এক দেহে লীন করার প্রস্তাব। আর এবার প্রস্তাব রেখেছেন, কোন ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক নয়, স্বয়ং বাঙ্গালী মুসলমানের সন্তান, যারা ৪৭-এর স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেছেন সবচেয়ে বেশি করে।

এরপরও কি বিশ্বাস করার অবকাশ আছে যে এদেশের সংখ্যাগুরু মানুষ মুসলমান হওয়ায়, দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্ট ব্যাটেনের প্লান যখন ঘোষিত হয়, তখন একজন ব্রিটিশ সিভিলিয়ন টাইসন পূর্ববঙ্গকে বলেছিলেন 'রুর‍্যাল স্লাম'। ব্রিটিশ শাসন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই রুর‍্যাল স্লামই পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদেশে শিল্পখাতে সর্বসাকুল্যে বস্ত্রকল ৫টি, ৪টি চিনিকল ও একটি সিমেন্ট কারখানা ছিল। পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল বলে খ্যাতি থাকলেও একটাও পাটকল ছিল না। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর ৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে সেই রুর‍্যাল স্লামের বুকেই পাটকল স্থাপিত হয়েছিল ৭৬টি, বস্ত্রকল স্থাপিত হয়েছিল ৫৯টি, চিনিকল ১৫টি, এছাড়াও বহু ইস্পাত কারখানা, রিফাইন্যারি, রাসায়নিক কারখানা, কাগজ কল, ঔষধের কারখানা, চামড়া ও জুতার কারখানা, বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র, মেশিনটুলস ফ্যাক্টরী, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী, বিমান বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, টিভি স্টেশন, রেডিও স্টেশন নির্মিত হয়েছিল। রুর‍্যাল স্লাম থেকে উন্নয়নের এই ধারা বিশেষজ্ঞদের মতে সন্তোষজনক বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু আধিপত্যবাদীদের স্বদেশী দোসররা এই উন্নয়নের

www.nagorikpathagar.org

বিকৃত ব্যাখ্যা করে জনগনকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে পশ্চিম পাকিস্তান পুঁজিপতিরা এদেশে শুধুই শোষণ করেছে। বুঝতে দিল না জনগণকে যে দেশভাগ হওয়ার সময় পূর্ব্ব পাকিস্তান ছিল এক গন্ডগ্রামভর্তি এলাকা, যেখানে ছিল না কোন সমৃদ্ধ শহর ছিল না কোন কল-কারখানা।। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল তখন চার চারটি রাজধানী শহর, লাহোর, করাচী, পেশোয়ার ও কোয়েটা এই সমুদয় এলাকা বিশেষ করে পাঞ্জাব ছিল শিল্প-কারখানা, কৃষি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ছিল ভরপুর। ফলে, দুই পাকিস্তানের এক হয়ে থাকা সম্ভব হলো না, শক্তিশালী পাকিস্তান ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে গেল। যার ফলে লাভ হল তাদের যারা পূর্ব পাকিস্তানকে পিষে মারতে চেয়েছিলেন। আজ বেরুবাড়ী তালপট্টি দখল, উজানের পানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বাংলাদেশকে আবার ল্যান্ড অব বেগার বা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত করা, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এসবই সেই উদ্দেশ্যের পরিনতি।

আজ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলে এপার বাংলা ওপার বাংলার ধূয়া ধরা হচ্ছে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাই যদি আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি হত, তাহলে পশ্চিমবংগ তো ভারতের অংশ হওয়ার কথা নয়। ১৯০৬ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যারা পূর্ব বাংলা, অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশকে অখন্ড ভারতের একটা প্রদেশের মর্যাদা নিয়েও টিকে থাকতে দেয়নি, বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ রোধ করার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন করেছে, ১৯৪৭ সালে তারাই কেন, আমাদের সাথে স্বাধীন বাংলায় থাকার চাইতে, বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়ে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিলীন হয়ে গেল। বাংলা ভাষাভাষী ভাইএরা খোট্টা হিন্দি ভাষী ভারতীয়দের সাথে একাত্ম হওয়াকে শ্রেয় মনে করলো কেন? গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে সে কথা আজ আবেগ শূন্য মন নিয়ে ভেবে দেখতে হবে।

৭১-এর পর মুসলমান নামধারী কোন কোন বুদ্ধিজীবি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করছেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল বলেই নাকি পাকিস্তান টেকেনি। তাহলে তো স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায় ভারত টিকে আছে কিসের ভিত্তিতে? উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতের সাথে পশ্চিম ভারতের মারাঠাদের পোষাক পরিচ্ছদ ঐতিহ্য সংস্কৃতির তো কোন মিল নেই। তারপরও তারা একসাথে টিকে আছে কি করে? দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের সাথে পশ্চিম বংগের মছলীখোর বাঙালী একই রাষ্ট্রকাঠামোর আওতায় বাস করছে কি করে? তাদের মধ্যে একমাত্র

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় বন্ধন হিন্দু হওয়া ছাড়াতো আচার ব্যবহার, পোষাক, খাদ্য, সংস্কৃতি, ভাষা কোন কিছুরই মিল নেই। আসলে ওসব কিছু নয়। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ নামক যে কাঁটাটি তাদের গলায় আটকে আছে তাকে উৎপাটন করার জন্যই এসব ছলনার অবতারণা। পাটের সাথে যেমন আগাছা জন্মায়, মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি মীরজাফর, মীর সাদিক, আল ইদরুস যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে। বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগুরুর দেশ হলেও তার স্বাধীনতা শংকামুক্ত নয়। কারণ যে দেশের মানুষ টাকার অংকে দেশপ্রেম বিক্রি করে, অন্যের প্ররোচনায় আপন পরিচয় মুছে ফেলে ইতিহাস ঐতিহ্যের মুখে কালিমা লেপন করে, উদারতার ছদ্মবেশে আত্মপরিচয় ধূলায় মিশিয়ে দেয়, টাকার লোভে কিংবা সামান্য পদ পদকের লোভে দেশের মান মর্যাদা, গোপন দলিল এমন কি দেশের মাটি ও সম্পদের অংশ আধিপত্যবাদিদের হাতে তুলে দেয়, যে দেশের মানুষ নিজের মাটি মানুষের সাথে সদা বিশ্বাসঘাতকায় লিপ্ত থাকাকে গৌরব মনে করে, সে দেশের মুসলমান জনসংখ্যা ৮৮.৫ ভাগ হলেও তারা হায়দারাবাদের ১০.৪ ভাগ মুসলমানের সমান শক্তিশালীও নয়।

কিছু কিছু বুদ্ধিজীবি আবার ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে বড়াই করে বলেন, ভাষা আন্দোলনই নাকি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা পর্ব। সেখানেও কথা থেকে যায়। ১৮টি আঞ্চলিক জাতিসত্ত্বার এবং ১০৫টি ভাষা উপভাষার দেশ হয়েও হিন্দু প্রধান ভারতে বিহারী, বাঙালী, গুর্খা, মারাঠী, তামিল, গুজরাটি, রাজপুত সবাই এক ভারতীয় হিন্দু জাতিসত্ত্বার পরিচয়ে টিকে থাকলো, অথচ মাত্র ৬টি আঞ্চলিক জাতিসত্ত্বা যেমন বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত এবং বাংলা, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বালুচী, বারুহী, পস্তু, কাশ্মিরী, ৭টি ভিন্ন ভাষার দেশ হয়ে পাকিস্তান মুসলমান জাতিসত্ত্বার পরিচয়ে এক হয়ে টিকে থাকতে পারলনা কেন? আবেগ বিবর্জিত মানুষের মনে এ প্রশ্ন আসে বৈকি। আর তখনই মনে হয় হায়দারাবাদের শিক্ষা আমাদের বড় প্রয়োজন। এসব প্রশ্নের উত্তর যদি বইটিতে পাওয়া যায় তাহলে এই লেখা সার্থক হবে।

এই বই এর সবটুকু কৃতিত্ব যার প্রাপ্য তিনি হলেন আমার অনুজপ্রতিম, ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধানী কবি আবদুল হাই শিকদার। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, তারই উদ্যোগে প্রেস ক্লাবে হায়দারাবাদ আগ্রাসন দিবস উপলক্ষে এক সেমিনার

www.nagorikpathagar.org

অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব এবং সেই সাথে ঘন ঘন তাগিদ যদি তিনি না দিতেন, তাহলে এই বই লেখা কোন দিনই সম্ভব হত না। সুতরাং তাঁর প্রতি রইলো আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বইটি দীর্ঘ দিন পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে থাকার পর কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি যে প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন সে জন্য তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমার জানামতে ভারতের হায়দারাবাদ দখলের ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখা এটাই হবে প্রথম বই। কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বইটি প্রকাশ করে এক নির্ভিক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন। হায়দারাবাদের জনগনের জন্য চোখ অশ্রুসিক্ত হয় এমন মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে অভাব নেই। আমার ধারনা বইটি তাঁদের কাছে অভিনন্দিত হবে।

বইটি লেখার আর একজন উৎসাহদাতা হলেন, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ঐতিহ্য সচেতন সম্পাদক জনাব এম. এম. বাহাউদ্দিন। তাঁরই উৎসাহে এবং বিভাগীয় সম্পাদক কবি আবদুল হাই শিকদারের উদ্যোগে, ক্ষুদ্র সংস্করণের সেই সেমিনার প্রবন্ধটি ইনকিলাব পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়ে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবন্ধটি পাঠ করে, সর্বপ্রথম প্রশংসাসূচক টেলিফোনটিও করেছিলেন জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন। এই সুযোগে তাঁকেও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বইটির পাণ্ডুলিপি নির্মাণে অকৃত্রিম সহযোগিতা যাদের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁরা হলেন ইঞ্জিনিয়ার ফজলে এলাহী সাহেব, নাট্যমঞ্চ বাংলাদেশ এর সম্পাদক জনাব আবদুল হান্নান, সাপ্তাহিক রোববার এর সহ সম্পাদক জনাব গোলাম আম্বিয়া ও মাহবুবুর রহমান বুলবুল। তাঁদের সবার প্রতি রয়ে গেল অশেষ ঋণ।

সবার উপরে, আবেগের গাঢ় প্রলেপ মুছে ফেলে ইতিহাসের সত্যলোকে উদ্ভাসিত হতে, বইটি যদি পাঠককে কিছুমাত্র সাহায্য করে তাহলেই শ্রম স্বার্থক হয়েছে মনে করবো।

বইটির প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

আরিফুল হক
৪৩৯ শাহীনবাগ,
তেজগাঁও, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

পূর্ব কথা # ১৭
নিজাম শাহী রাজ্যের গোড়াপত্তন # ১৯
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে # ২১
বৃটিশ সাম্রাজ্যে অবশেষে সূর্য অস্ত গেল # ২৪
অতঃপর হায়দারাবাদ # ২৮
আগ্রাসনের পূর্ব প্রস্তুতি # ৩২
ইত্তেহাদুল মুসলেমিন গঠিত # ৩৪
এলো সেই বিড়ম্বিত দিন # ৩৮
আত্ম সমর্পনের সেই কূখ্যাত দিন # ৪৪
আজকের বাংলাদেশ # ৪৭
আলোক চিত্র # ৫৫

www.nagorikpathagar.org

হায়দারাবাদের প্রথম নিজাম

www.nagorikpathagar.org

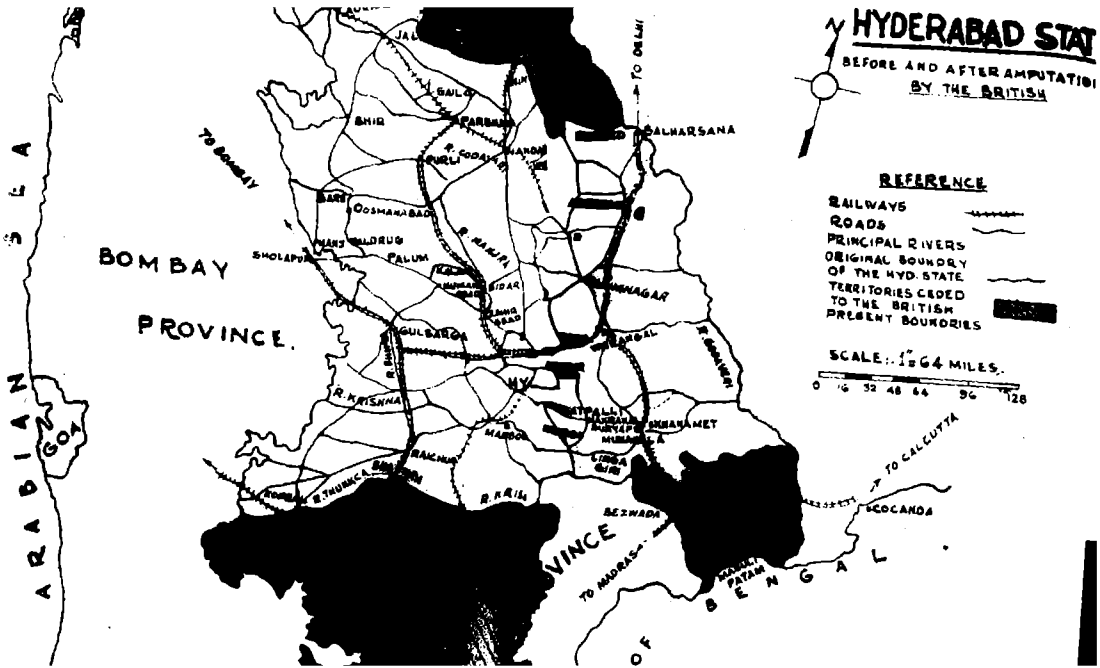

www.nagorikpathagar.org

পূর্ব কথা

মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব বলেছিলেনঃ

"খামোশী- মেঁ নিহাঁ খুঁ-কুশ্‌তহ্‌ লাখোঁ আরজুঁয়েঁ -হৈঁ;

চিরাগ-এ মুর্দহ্য হুঁ মৈঁ বেজ্‌বান গোর-এ গরীবাঁ-কা।

অর্থাৎ আমার অজস্র নিহত যাচনা মৌনের চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে নিঝ্‌ঝুম গোরস্থানে আমি একটি নিভে যাওয়া প্রদীপ। পৃথিবীর বিস্ময়, জ্যোতির পাহাড় 'কোহিনুর'-এর জন্মদাত্রী হীরক-আকর সমৃদ্ধ গোলকুন্ডার কন্যা হায়দারাবাদ। গোদাবরী কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা, পূর্ণা, ভীমা, পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, মুসী, প্রাণহিটা নদী বিধৌত সুজলা সুফলা হায়দারাবাদ।

ইতিহাস খ্যাত অজন্তা-ইলোরার গুহা, আওরঙ্গাবাদ, ওসমানাবাদ শহর, গোলকুণ্ডা, গুলবার্গ, ওয়ারাংগাল, রাইচুর, সুদ্‌গল, পারেন্দা, নলদূর্গ প্রভৃতি দূর্গের ঐতিহ্যমণ্ডিত হায়দারাবাদ। হীরক, স্বর্ণ, লৌহ, কয়লা, অভ্র প্রভৃতি মূল্যবান আকরিক সম্পদে সমৃদ্ধ হায়দারাবাদ। মক্কা মসজিদ, চারমিনারসহ পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনের আভিজাত্য সম্বলিত হায়দারাবাদ, আজ সত্যই নিঝুম গোরস্থানে নিভে যাওয়া এক প্রদীপ।

ডেকান মালভূমির প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত ৮২,৬৯৮ বর্গমাইল এলাকা বিস্তৃত, নিজাম শাসিত স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের নাম ছিল হায়দারাবাদ। যার চার পাশে মুখ ব্যাদান করে ছিল ভারত। উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিমে বম্বে প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলা। দক্ষিণে কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রা নদী, পশ্চিমে আহমদনগর, শোলাপুর, বিজাপুর, ধারওয়ার প্রভৃতি বম্বের জেলা শহর। পূর্বে ওয়ার্ধা গোদাবরী এবং মাদ্রাজের কৃষ্ণা জেলা, এভাবেই ভারত বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল হায়দারাবাদ।

অতীতে হায়দারাবাদের চেহারা এমন শীর্ণ-পরনির্ভর ছিলনা। দাক্ষিণাত্যের এই দেশীয় রাজ্যটির ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রাবিড় সভ্যতা এই রাজ্যেরই পূর্বাঞ্চলসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল। আজকের তেলেগু ভাষীরা সেই দ্রাবিড়দেরই উত্তর পুরুষ। পৌরানিক আমলের

www.nagorikpathagar.org

রামায়ণে বর্ণিত 'দক্ষিণাপথ' অঞ্চল এই রাজ্যেরই মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। রামায়ণে বর্ণিত কিষ্কিন্ধা অধিপতি বানর রাজা সুগ্রীব, যে সীতা উদ্ধারে রামকে সহায়তা করেছিল বলে রামায়ণে উল্লেখ আছে, সেই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যটি হায়দারাবাদের বিজয়নগর এবং আনেগুন্ডি স্থানে অবস্থিত ছিল বলে রাম অনুরক্তরা বিশ্বাস করেন।

বহিরাগত আর্যরা; কবে যে দক্ষিণাপথ বা ডেকান অধিকার করে ভূমিপুত্র দ্রাবিড়দের উৎখাত করেছিল সে ইতিহাস নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে খৃষ্টপূর্ব ২৭২-২৩১ অব্দে বৌদ্ধ রাজা অশোক সম্পূর্ণ বেরার এবং রাজ্যের উত্তরপূর্ব ও পূর্বাঞ্চল দখল করেছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

১২৯৪ খৃঃ আলাউদ্দিন খিলজীর দেবগিরি বা দৌলতাবাদ বিজয়ের মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩২৫ খৃঃ উলুঘ খাঁ, মুহম্মদ বিন তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনিই দাক্ষিণাত্যের রাজা মহারাজাদের পরাভূত এবং বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে; সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকই দেবগিরি নাম পরিবর্তন করে দৌলতাবাদ রাখেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও দিল্লী থেকে তার রাজধানী এখানেই স্থানান্তরিত করেন। এভাবেই দাক্ষিণাত্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দ্বারোৎঘাটিত হয়।

এর কয়েক বছর পর জাফরখান, আলাউদ্দিন হাসানশাহ, গাঙ্গু বাহমনী নাম ধারণ করে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। বাহমনী সাম্রাজ্যের পর, ১৩৪৭ থেকে ১৫১২ খৃঃ পর্যন্ত; কুতুবুল মুল্‌ক সুলতান কুলী প্রতিষ্ঠিত কুতুবশাহী বংশ এখানে রাজত্ব করেছিল। তারই স্ত্রী হায়দরী কোমের নামানুসারে হায়দরাবাদ নামের উৎপত্তি। তারপর ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব মারফত সমগ্র দাক্ষিণাত্য পুনরায় দিল্লীর শাসনাধীনে চলে যায়। হায়দারাবাদের ইতিহাসের বহতানদী এভাবেই জোয়ার ভাটার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে ছিল।

www.nagorikpathagar.org

নিজাম শাহী রাজ্যের গোড়া পত্তন।

"নাহ্ গুলে নগ্‌মহ্ হুঁ, না পরদহ্ এ সাজ,
মৈঁ, হুঁ আপনি শিকস্ত-কী আবাজ
(গালিব)

কবিতার ফুল নই, সেতারের পরদাহ নই, আমি কেবল একটি আওয়াজ, পরাজয়ে ভেঙ্গে পড়ার আওয়াজ।"

নিজাম শাহী রাজ্যের গোড়া পত্তন করেছিলেন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তুর্কী বংশোদ্ভুত কৃতি সেনাপতি মীর কমরউদ্দীন খান আসফজাহ। সাহসী যোদ্ধা এবং কুশলী রাজনীতিবিদ হিসাবে সম্রাটের আস্থাভাজন হওয়ায়, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭১৩ খৃঃ তাঁকে নিজাম-উল-মুল্‌ক্ উপাধিতে ভূষিত করে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। সেই থেকেই বংশ পরম্পরায় তাঁরা নিজাম নামে অভিহিত হয়ে আসছেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল সাম্রাজ্য দূর্বল হয়ে পড়লে দেশীয় হিন্দু রাজা মহারাজারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এই সময় ইরানের নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমন করেন। কথিত আছে যে, দিল্লী দখল করার পর নাদিরশাহ গণহত্যা চালানোর হুকুম দিলে, মোগল দরবারের সেই সময়ের সবচেয়ে সম্মানিত উমরাহ আসফজাহ নাদির শাহের সামনে নতজানু হয়ে দিল্লীবাসীর প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। নাদির শাহও আসফ জাহকে খাঁটি মুসলমান ভেবে, তাঁর সফেদ দাড়ির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গণহত্যা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নাদির শাহ্, আসফজাহকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করে ইরানে ফিরে যান। অতঃপর নানান উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ১৭২৪ খৃঃ হায়দারাবাদ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। আসফজাহ, বেরার প্রদেশটিও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং হায়দারাবাদকেই তাঁর আবাসস্থল এবং রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলেন। এভাবেই হায়দারাবাদে স্বাধীন আসফজাহী রাজবংশের সূচনা হয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম নিজাম মীর কমরউদ্দীন খান নিজামউল মুল্‌ক আসফজাহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মীর আহমদ খান নাসির জঙ্গ (১৭৪৮-৫০) এবং নিজাম কন্যা খায়রুন্নিসা বেগমের পুত্র, অর্থাৎ প্রথম নিজামের নাতি মুজফ্‌ফর জঙ্গ, উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদে মেতে উঠে। ঠিক এই সময় ভারতবর্ষে আগত দুই বিদেশী বণিক সম্প্রদায়-ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে পরস্পর প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ শুরু হয়ে গেছে। তারা দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তবিরোধের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার এবং তাদের শক্তিকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগানোর কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। হায়দারাবাদের সিংহাসন নিয়ে অন্তর্বিরোধের সুযোগে ইংরেজরা নাসির জঙ্গের পক্ষ এবং ফরাসীরা মুজফ্‌ফর জঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করে। শক্তির লড়াই-এ মুজফ্‌ফর জঙ্গ পরাজিত এবং চাচার হাতে বন্দী হন। কিন্তু মাত্র দু'বছরের মাথায় নাসির জঙ্গ আততায়ীর হাতে নিহত হলে, মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিজেকে স্বাধীন নিজাম ঘোষণা করেন। তিনি ফরাসী গভর্ণর ডুপলিক্সকে রাজ্যের পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দান করেন। এভাবেই দেশের শাসন ক্ষমতায় বিদেশীদের প্রভুত্ব এবং প্রভাব অনুপ্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.org

বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে

বিশাল মোগল সাম্রাজ্যর দূর্বল থেকে দূর্বলতর হয়ে পড়ল। সেই দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমগ্র উপমহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। শুরু হল পরস্পর শক্তির লড়াই, লোভ, হানাহানি, আমীর ওমরাহদের বিশ্বাসঘাতকতা। অপর পক্ষে যে হিন্দু মারাঠা শক্তি, দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান শক্তির কাছে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারেনি, তারাও সুযোগ বুঝে ইংরেজদের সাথে জোট বেঁধে ভারতবর্ষ থেকে মুসলিম শাসন উৎখাতের চক্রান্তে মেতে উঠলো। এদিকে, পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে ইংরেজরা বাংলা 'বিহার' উড়িষ্যার মালিক-মোখতার হয়ে বসেছে। এমতাবস্থায় মুসলমান শাসিত রাজ্যগুলি আপন অস্তিত্ব রক্ষার আশায়, বহিঃশক্তি ইংরেজ বা ফরাসীদের সাথে নানান চুক্তি, সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে এবং নানান সুযোগ সুবিধা দান করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করতে লাগলো।

গৃহ বিবাদের এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর রেষারেষির সুযোগে ফরাসী এবং ইংরেজ শক্তি হায়দারাবাদের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এভাবেই একদিন হায়দারাবাদের ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কর্নাটক যুদ্ধে ক্লাইভের সাফল্যের পর ইংরেজরা নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আসফজাহের তৃতীয় পুত্র সালাবত জঙ্গ (১৭৫১-১৭৬২) কে ক্ষমতায় বসান এবং কিছুদিন পর তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৭৬১ খৃঃ আসফজাহের চতুর্থ পুত্র মীর নিজাম আলি খানকে সিংহাসনে বসার সুযোগ করে দেন। এই মীর নিজাম আলি খানই (১৭৬২-১৮০৩) বৃটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ অবলম্বন করে মহীশূরের নর শার্দূল নওয়াব টিপু সুলতানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাঁকে পরাজিত এবং নিহত করার অপরাধে ইতিহাসে কলংকিত হয়ে আছেন। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজ শক্তিকে সহায়তা দানের জন্য ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষ হায়দারাবাদের নিজাম শাহীর উপর এতই ক্ষুদ্ধ ছিল যে ১৯৪৮ সালে ভারতের শেষ নিজামের

www.nagorikpathagar.org

পতনের সময়ও অনেকে হায়দারাবাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান নি।

ঘটনার পিছনেও ঘটনা থাকে। সে কথা বিস্মৃত হলে এমন সব দূর্ঘটনা ঘটে যায় যে সমগ্র জাতিকে তার খেসারত দিতে হয়। ভারতে মুসলমান শাসনের পতনের ইতিহাসে ঐতিহ্যমণ্ডিত হায়দারাবাদ থেকে মুসলিম শাসন উচ্ছেদের ঘটনাটিও ছিল, জাতি হিসাবে মুসলমানদের জন্য শোকাবহ ঘটনা। ১৭৫৭ খৃঃ ২৩ জুন পলাশীযুদ্ধে ইংরেজ শক্তির বিজয়ের পর ইংরেজরা একে একে বহু দেশীয় রাজ্য গ্রাস করতে থাকে। এভাবে তারা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়। এই আগ্রাসনে ইংরেজদের সহায়তা দানে এগিয়ে আসেন হিন্দু এবং মারাঠা শক্তি। এমনি এক প্রতিকুল অবস্থায় হায়দারাবাদের নিজাম আলি খান দেশের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে ১৭৬৮ খৃঃ ইংরেজদের সাথে এক অনাক্রমন চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নিজাম নিজদেশের ৪টি অঞ্চল বার্ষিক মাত্র ৯ লক্ষ টাকা খাজনায় ইংরেজদের কাছে হস্তান্তর করে। ইংরেজরা নিজস্ব সৈন্য বাহিনী রাখার অধিকার পায় এবং উভয় পক্ষের কোন একজন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে এক পক্ষ অপর পক্ষকে সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ৪র্থ মহীশূর যুদ্ধে হায়দারাবাদ টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করতে বাধ্য হয়েছিল। উপরন্তু সেই যুদ্ধে হায়দারাবাদের পক্ষে যিনি সেনাপতিত্ব করেছিলেন, সেই সেনাপতি মীর আলম ছিলেন ইংরেজদের খাস লোক। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসাবে কয়েক বৎসর তাদেরই আশ্রয়ে কলকাতায় বসবাস করেছিলেন। তাই বলছিলাম ঘটনার পিছনেও ঘটনা থাকে। তবে আপন শক্তির উপর আস্থাহীন হয়ে ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করলে দেশ রক্ষা বা স্বাধীনতা রক্ষা কোনটাই যে সম্ভব হয় না, স্বাধীন রাজ্য হায়দারাবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সে কথাই প্রমাণ করেছে।

প্রায় ফ্রান্সের আয়তন বিশিষ্ট ছিল যে হায়দারাবাদ, সেই বিশালদেশ, বিভিন্ন সময় নতজানু চুক্তির ফলে, নানান ছলছুতায় ছাড় দিতে দিতে, কাটছাঁট করতে করতে, ইংরেজদের আমলেই ব্রিটেনের আকার ধারণ করে। শাসক নিজামদের ভয় এবং দূর্বলতার কারণেই বেরার প্রদেশ, কুড্ডাপপা, কুন্নুল বেলারী, অনন্তপুর প্রভৃতি জেলা, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো, যার মাধ্যমে তাদের

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্র সংযোগ ছিল, একে একে হাতছাড়া হয়ে যায়। সমুদ্রপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হায়দারাবাদ বহিঃর্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গৃহবন্ধী হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতাই পরবর্তীতে তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল, সেদিন হায়দারাবাদের নিজামেরা যেমন ভুল করে, বহিঃবির্শ্বের সাথে যোগাযোগের সমুদ্র বন্দর বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলেন তেমনি আজকের বাংলাদেশও পার্বত্য শান্তি চুক্তির নামে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরসহ সম্পূর্ণ কক্সবাজার উপকূল ভারতের প্রভাব বলয়ে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা গৃহবন্দী হতে চলেছে। এ যেন একই নীল নক্সার পুনরাবৃত্তি। অথচ আমরা সেই নীলনক্সা পড়তে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। প্রত্যেক জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, জাতির জীবনে যখন অধোগতির চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ এগিয়ে আসে, তখন সে এভাবেই অসচেতন হয়ে আপন ভুলের আবর্তে আপনি তলিয়ে যায়, যেমন হায়দারাবাদ গিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

বৃটিশ সাম্রাজ্যে অবশেষে সূর্য অস্ত গেল।

যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য্য অস্ত যেত না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেই ব্রিটিশরা অনুধাবন করলো যে বিশ্বব্যাপী শাসন শোষণ করার দিন তাদের শেষ হয়ে এসেছে। সেই উপলব্ধি তাদের আরো দৃঢ় হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এই সময় তারা বুঝতে পারলো বিশ্বব্যাপী উপনিবেশগুলিকে আর ধরে রাখা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জয়ের কৃতিত্বের দাবীদার উইনষ্টন চার্চিলের রক্ষণশীল দল যুদ্ধ পরবর্তী নির্বাচনে বিস্ময়করভাবে শ্রমিক দলের কাছে পরাভূত হল। ১৯৪৫ সালে ক্লিমেন্ট এটলীর নেতৃত্বে শ্রমিকদল ব্রিটেনে সরকার গঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শ্রমিক দলীয়রা আগে থেকেই উপনিবেশগুলির, বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে বেশ সোচ্চার ছিল। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে, ভারতীয়দের হাতে শাসনভার তুলে দেওয়ার কাজটিকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে লাগলো। কিন্তু সমস্যা হলো ব্রিটেন কার হাতে ভারতবর্ষের ক্ষমতা অর্পন করবে? ভারত তখন হিন্দু ও মুসলমান দুইটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জাতি হিসাবে স্বীকার করছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত করে, ইংরেজদের সাথে তাদেরও ভারত ছেড়ে সৌদি আরব চলে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছে। এমতাবস্থায়, হিন্দু-মুসলমান দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের অধিকার অক্ষুন্ন রেখে তাদের সম্মিলিত কর্তৃপক্ষের হাতে একটি নির্দিষ্ট সংবিধানের আওতায় ক্ষমতা তুলে দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল ভারতকে হিন্দু ও মুসলিম প্রধান দু'টি এলাকায় বিভক্ত করে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। ব্রিটেন এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের বৈধ প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ভার তুলে দিয়ে ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

ভারত বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন আর এক সমস্যা দেখা দিল। ভারতে তখন কয়েক'শ দেশীয় রাজ্য ছিল, যেগুলি

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশ সরকারের সাথে বিশেষ চুক্তি বা ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হত। ভারত বিভক্ত হলে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কি হবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে দেখা দিল। ব্রিটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, ভারতে নিযুক্ত শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে বার্কিংহাম প্রাসাদে ডেকে নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার কথা জানালেন এবং বললেন; দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে ব্রিটেনের সরাসরি সন্ধি রয়েছে। ভারত স্বাধীন হয়ে গেলে সেই সন্ধির ইতি ঘটবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে শুণ্যতা দেখা দেবে। তখন ঐ সব রাজ্যের রাজারা গভীর সংকটে নিপতিত হবে। সুতরাং ওরা যাতে স্বাধীনরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়টি যেন বিশেষ ভাবে দেখা হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং মিত্র করদ রাজ্যগুলোকে নিয়ে যে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেই প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যগুলোকে, নির্দিষ্ট আলাদা-আলাদা চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন যখন সম্ভব হলো না তখন, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে প্রণীত ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হল যে, ১৯৪৭-এর ১৪ আগষ্টের পর দেশীয় রাজ্যগুলির উপর থেকে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ অবসানের পর রাজ্যগুলি স্বীয় ইচ্ছামত ভারত অথবা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের এই নীতি যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত হলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনের ষড়যন্ত্রে এই নীতি কার্যকর হতে পারেনি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। তারা দেশীয় রাজ্য আত্মীকরণের জন্য বিশেষ একটি বিভাগ চালু করেন যার প্রধান করা হয় সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে এবং সেক্রেটারীর পদ দেয়া হয় ভি-পি কৃষ্ণ মেননকে।

ধূর্ত প্যাটেল উপলব্ধি করলেন যে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ব্রিটিশ প্যারামাউন্সির অবসান ঘটলে দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন বলে পরিগণিত হবে, এবং তখন রাজ্যগুলি ভারতভুক্ত করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে, কাজেই আগে থেকেই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা উচিত। এ ব্যাপারে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের প্রভাব কাজে লাগানোর জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পরও তাঁকে ভাইসরয় হিসাবে চাকরিতে রেখে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭-এর ২৫ জুলাই দেশীয় রাজাদের এক বৈঠক ডাকলেন। সেখানে তিনি খোলাখুলি ভাবে তাদের ভারত ডোমিনিয়নে যোগদানের অনুরোধ জানিয়ে বললেন- কংগ্রেসের পরিকল্পনায় 'অন্তর্ভুক্তির দলিলে' তাদের জন্য একটা বিশেষ সুবিধা আছে। কি সেই সুবিধা, সে কথা উহ্য রেখেই তিনি তাদের পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়ে বললেন-১৫ আগষ্টের পর তাদের হয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা তার থাকবেনা এবং যে সব দেশীয় রাজ্য স্বাধীন থাকার জন্য অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার চিন্তা করছেন তাদের চিন্তা কোন কাজে লাগবে না। তিনি আরও বললেন, দেশীয় রাজারা যদি ভারত ভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন তবে ভবিষ্যতে তাদের পদবী, সম্মান যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে জন্য তিনি কংগ্রেসকে রাজী করাবেন। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের সে দিনের আশ্বাস যে কত বড় মিথ্যা ছিল পরবর্তীতে ভারতের উদরে দেশীয় রাজ্যগুলি এবং রাজাদের অবলুপ্তিই তার সাক্ষ্য বহন করে।

যাই হোক, কংগ্রেস এবং মাউন্টব্যাটেন চক্রের সেদিনের কৌশল অভাবিত সাফল্য এনে দিয়েছিল। দেশীয় রাজাদের অধিকাংশই ১৫ আগষ্টের পূর্বেই ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যারা স্বাক্ষর দানে অসম্মতি প্রকাশ করলেন, তাদের জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করা হল। যে সব রাজা স্বাক্ষর দান করলেন না, তাদের রাজ্যে কংগ্রেসের একটা গোপন সংস্থাকে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য লেলিয়ে দেয়া হল। যেমন ত্রিবাংকুরের মহারাজার প্রধানমন্ত্রী মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে, ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর না করার কথা জানিয়ে দিলেন। ব্যস আর যায় কোথায়; কংগ্রেসের গোপন সংস্থার সদস্যরা পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে গেল। কো চিনে এক মহা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষাপটে ত্রিবাংকুরের মহারাজা বাধ্য হয়ে ভারত ভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করলেন।

যোধপুর ছিল পাকিস্তান এবং ভারত উভয়েরই সীমান্তবর্তী রাজ্য। যোধপুরের মহারাজা ছিলেন কংগ্রেসের প্রতি দারুন বীতশ্রদ্ধ। তিনি পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ছিলেন। একথা প্রকাশিত হওয়ায় সাথে সাথেই ভি পি কৃষ্ণমেনন প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে মাউন্টব্যাটেনের কাছে নিয়ে যান। মাউন্টব্যাটেন একই ভাবে তাঁকে ভয় ও লোভ প্রদর্শন করায় তিনিও ভারতের খাঁচায় ধরা দিতে বাধ্য হন।

www.nagorikpathagar.org

ভুপালের নবাব ছিলেন মুসলমান, আর রাজ্যের সংখ্যাগুরু অধিবাসী ছিল হিন্দু। ভুপালের নবাব স্বাধীন থাকার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পারেন নি। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানেও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হলো। অপর দিকে কংগ্রেসের তরফ থেকে ছিল হুমকি ও প্রলোভন। ফলে ভুপালের নবাবও স্বাধীন থাকতে পারেন নি, তিনিও ভারতে মিশে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্টের মধ্যে হায়দারাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের প্রত্যাশিত সকল দেশীয় রাজ্যই ভারতে অন্তর্ভূক্তির দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা বা দেশ বিভক্তির পর, ভারত এই তিনটি রাজ্য গ্রাস করার ফন্দি ফিকির আঁটতে থাকে। আগের মতই তাদের সাহায্য সহযোগিতা দান করেন পূর্বতন ব্রিটিশ ভাইসরয় এবং সেই সময়ের ভারতের গভর্ণর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন।

জুনাগড়ের নবাব ছিলেন মুসলমান। কিন্তু জনগনের বেশীর ভাগ জনগন ছিল হিন্দু এবং স্বাভাবিক ভাবে ভারতীয় কংগ্রেস সমর্থক। ভু-প্রকৃতিগত ভাবে জুনাগড়ের অবস্থান ছিল খানিকটা বাংলাদেশের মত। বাংলাদেশ যেমন তিন দিকে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একদিকে সমুদ্র। জুনাগড়ও তেমনি তিন দিকে দেশীয় রাজ্য এবং একদিকে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ১৯৪৭-এর ১৫ আগষ্ট জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগদানের কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে কংগ্রেসের গোপন সংস্থা দেশটিতে বিশৃংখলা শুরু করে দেয় এবং ভারতীয় সৈন্যরা জুনাগড় ঘেরাও করে ফেলে। নভেম্বরে ভারতীয় সৈন্য জুনাগড়ে প্রবেশ করে এবং দেশটি দখল করে নেয়। পাকিস্তানে যোগদানকারী কোন রাজ্য সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে দখল করে নেয়ার সেটাই ছিল ভারতের প্রথম পদক্ষেপ। জুনাগড় দখলের ভারতীয় অজুহাত ছিল, সেখানকার জনগন বেশির ভাগ হিন্দু, তারা ভারতে যোগদানের পক্ষাপাতি কাশ্মীরের বেলায় ভারত সেই অজুহাত মানতে রাজী হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর হায়দারাবাদ

বিখ্যাত উর্দূকবি মীর্জা খান দাগ হায়দারাবাদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ-

"দিল্লী সে চলো দাগ, করো সায়র ডেক্কান কি,
গওহর কি হুয়ি কদর, সমুন্দর সে নিকাল কে।
হায়দারাবাদ রহে তা-বাঁ, কায়ামাৎ কায়েম'
এহি, এ্যায় দাগ, মুসলমানকি এক বসতি হ্যায়।"

অর্থাৎ হে দাগ! দিল্লী ছাড়, দাক্ষিণাত্যের পথে ভ্রমণ করো, মুক্তার দামতো তখনই হয় যখন সে সমুদ্রের বাইরে আসতে পারে। হায়দারাবাদ কায়ামাৎ পর্যন্ত উজ্জ্বল থাক, চিরঞ্জীব হোক, কারণ এইতো একমাত্র স্থান যেখানে মুসলমানরা বাস করতে পারে।

কবি দাগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। স্বাধীন হায়দারাবাদ বেঁচে থাকতে পারেনি, মুসলমানদের আবাসস্থল হয়েও টিকে থাকেনি। তাঁর স্বপ্ন সাধের অর্ধ শতাব্দী পূর্ণ না হতেই হায়দারাবাদ ভারতের আধিপত্যবাদের শিকারে পরিণত হয়ে তার বিশাল উদরে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। হায়দারাবাদ এখন নাম নিশানাহীন, বিস্মৃত অতীত মাত্র। ৫'শ বছরের প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত, আসফজাহী রাজবংশের সকল নাম নিশানা মুছে ফেলা হয়েছে। হায়দারাবাদ এখন ভারতের অনেকগুলো শহরের মধ্যে, নামগোত্রহীন একটা শহর মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি মীর তকী মীর সত্যই লিখেছেন ঃ-

"ওহ দিল নহী রহা হ্যয়, নহ্ ওহ আব দিমাগ হ্যায়
জী এনমেঁ আপনে বুঝতাসা কোই চিরাগ হ্যায়"

অর্থাৎ সেই হৃদয়ও নেই, সেই মাথাও এখন নেই শরীরে প্রাণ আছে কিন্তু সে যেন নিভু নিভু প্রদীপ! স্বাধীন হায়দারাবাদের কেন এমন পরিণতি হল, সে কথা কি ইতিহাসের বিস্মৃত ছেঁড়াপাতা হয়েই পড়ে থাকবে? সেই ইতিহাস থেকে কি শিক্ষনীয় কিছুই নেই?

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের তুলনায়ও আয়তনে বড়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুবিশাল রাজ্য হায়দারাবাদ। শুধু আয়তনের দিক থেকে নয়, সম্পদ, সমৃদ্ধি, সামর্থের দিক থেকেও, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার সকল সম্ভাবনাই হায়দারাবাদের ছিল। হায়দারাবাদের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ছিল। নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা ছিল। সেনাবাহিনী ছিল। আইন আদালত ছিল, বিচার ব্যবস্থা ছিল। হাইকোর্ট ছিল শুল্ক বিভাগ ছিল। নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, ভাষা ছিল। নিজস্ব পতাকা ছিল, জাতীয় সংগীত ছিল, দেশে দেশে নিজস্ব রাষ্ট্রদূত ছিল, জাতিসংঘে নিজস্ব প্রতিনিধি ছিল।

তা ছাড়াও ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে হায়দারাবাদকে স্বাধীন মর্যাদা দান করে বলা হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলির পদমর্যাদা এবং স্বাভাবিক কার্যাবলী স্বাধীন ভারতের কাছে, রাজ্যগুলির অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা যাবে না।

১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় বিষয়ক সচিব লর্ড লিষ্টোয়েল (Lord Listowel) লর্ড সভায় বলেছিলেন, "এখন থেকে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি প্রত্যাহার এবং তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হল"। তিনি আরও বলেছিলেন "দেশীয় রাজ্যগুলি, ভারত, পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনটিতে যোগ দেবে, অথবা একক স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখবে, তা সম্পূর্ণ তাদের স্বাধীন ইচ্ছাধীন। ব্রিটিশ সরকার সে বিষয়ে কোন রকম প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে না"। ১৯৪৭ সালের ১০ জুলাই তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী হাউস অব কমন্স-এ ভারত সচিবের অনুরূপ বক্তব্যই প্রদান করেছিলেন।

এভাবেই, ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইন পাস হওয়ার সাথে সাথেই হায়দারাবাদের উপর ব্রিটিশ খবরদারিত্বের অবসান ঘটে, এবং ঐ দিন থেকেই হায়দারাবাদ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। যেহেতু হায়দারাবাদ ও ব্রিটিশের মধ্যে পূর্বের চুক্তিগুলি ব্রিটিশরাই বাতিল ঘোষণা করেছিল, সেহেতু কোন প্রকার চুক্তি বা শর্ত দ্বারাই হায়দারাবাদের নিজাম আর আবদ্ধ থাকলেন না।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের ৯ তারিখে হায়দারাবাদের নিজাম তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনকে এক পত্রে লিখলেন, ব্রিটিশরাজ ও হায়দারাবাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক হায়দারাবাদ তার স্বাধীন

www.nagorikpathagar.org

অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। তিনি ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন নিজামের পত্রটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করার আশ্বাস দিলেও, নিজাম কোনদিন সে পত্রের উত্তর পাননি। কারণ লর্ড মাউন্টব্যাটেন পত্রটি আদৌ ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠাননি। ধূর্ত নেহেরু-প্যাটেল চক্র ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সাথে মাউন্টব্যাটেনের আত্মীয়তার সুযোগটি খুব সুচতুর দক্ষতায় ভারত বিভাগ পর্যায়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট স্বাধীন পাকিস্তানের ঘোষণা দেয়া হল, ১৫ আগষ্ট ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেই ভারতের গভর্ণর জেনারেল করে স্বাধীন ভারত বা হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠিত হল। ঐ দিনই হায়দারাবাদ তার স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। যেহেতু আগে থেকেই সমুদ্র পথ বন্ধ করে হায়দারাবাদকে একটা স্থল পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছিল, সেহেতু নিজাম বাহাদুর হায়দারাবাদের সাথে ভবিষ্যত সম্পর্ক নির্ধারণ পর্যন্ত ভারতকে একটা নিষ্ক্রিয়তা মূলক চুক্তি করতে অনুরোধ জানালেন।

নানান টালবাহানার পর ভারত ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে এক নিষ্ক্রিয়তামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। তারপর থেকেই শুরু হয় খাঁটি ভারতীয় ষ্টাইলের সক্রিয় চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র। হায়দারাবাদ জোর করে দখল করার নানান প্রক্রিয়া।

১৯৪৮ সালের ৩০ জুলাই ব্রিটিশ কনজ্যারভেটিভ পার্টির বিরোধী দলীয় নেতা, প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর একটি বক্তব্য; "যদি এবং যখন প্রয়োজন মনে করবো, হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান শুরু করা হবে।" এই দাম্ভিক উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কমন্সসভায় বলেছিলেন; "নেহেরুর ভীতি প্রদর্শনের ভাষা অনেকটা হিটলারের ভাষার অনুরূপ যা তিনি অষ্ট্রিয়া ধ্বংস করার সময় ব্যবহার করেছিলেন"। (Churchill Compared Nehru's threat to the language which Hitler might have used before the devouring of Austria) (V.K Bawa, The last Nizam) তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, "তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে-যে সমস্ত রাজ্যকে সার্বভৌম মর্যাদা দান করা হয়েছে, সেগুলোকে গ্রাস করা, শ্বাসরুদ্ধ করা বা অনাহারে

www.nagorikpathagar.org

রেখে শক্তিহীন করে গ্রাস করার অপচেষ্টাকে ব্রিটিশ সরকার যেন অনুমোদন না দেয়"।

১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই নিজাম ব্রিটিশ সরকারকে যে পত্র দিয়েছিলেন সেই পত্রে তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে হায়দারাবাদের শিক্ষা সংস্কৃতির সাদৃশ্য এবং যোগসূত্র বিদ্যমান, তদুপরি হায়দারাবাদের দীর্ঘস্থায়ী স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্খার কারণেই তিনি ভারতভুক্ত হতে আগ্রহী নন। কিন্তু সেদিনের বিশ্বজনমত আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়ম, শুভচিন্তা, সততা, বর্বর পশুশক্তির কাছে পরাজিত হয়েছিল। দুর্বলের ক্ষীণকণ্ঠ, সবলের মিথ্যা প্রচারও কামান ট্যাঙ্কের কানফাটা নিনাদের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ক্ষুদ্র শক্তিহীন হায়দারাবাদের পাশে দাঁড়াতে পৃথিবীর কোন সংঘ বা পরিষদ সুবিচার বা দায়িত্ববোধের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেনি। ভারত তার ক্ষাত্রশক্তি বলে মিলিটারী অপারেশন চালিয়ে ১৯৪৮ খৃঃ ১৮ সেপ্টেম্বর, মাত্র ৫ দিনের যুদ্ধে, জোর করে হায়দারাবাদ দখল করে নেয়। হায়দারাবাদ ট্রাজেডীর সেই হিংস্র, কুটিল আগ্রাসী আচরণের করুণ কাহিনী দেখে মীরের কবিতার কথা মনে পড়ে যায়।

হুঁ শমা-এ আখিরে শব্, সুন সরগুজশ্ত মেরী
ফির সুব্হ হোনে তক্তো কিসসা হী মুখ্তসর হ্যায়।"
(মীর তকীমীর)

শেষ রাতের প্রদীপ আমি, শুনে নাও আমার দুঃখের কাহিনী, ভোর হতে হতে তো সবই শেষ হয়ে যাবে। হয়তো শেষ হয়েও গেছে। হায়দারাবাদ যে একদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য ছিল, সে কথা বিশ্ববাসীর মনে আছে কি?

www.nagorikpathagar.org

আগ্রাসনের পূর্ব প্রস্তুতি

শর্ত্ সলীক্হ হ্যায় হর এক অমর মেঁ
এ্যাবভী কর্নে কো হুনর চাহিয়ে।
(মীর)

সব কাজেরই একটা শোভন রীতি আছে। অপরাধ করবার জন্যও কুশলী হতে হয়। ভারতের হায়দারাবাদ দখল অপরাধের মধ্যেও কুশলতা ছিল।

হায়দারাবাদের প্রতিটি হিন্দু সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা সকলেই ছিল ভারতের মূল সংগঠনের শাখা। তাদের করণীয় কাজ স্বদেশ ভূমির বাস্তবতা বা কল্যাণ নির্ধারণ নিয়ে ছিল না। তারা ভারতে অবস্থিত মূল সংগঠনের দিকে তাকিয়েই কর্মসূচী তৈরি করতো। তাদের আর্থিক সাহায্য ও কর্ম নির্দেশনা আসতো সীমান্তের ওপার থেকে। হায়দারাবাদ ছিল দীর্ঘ দিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হিন্দু সংগঠনের ব্যর্থ অযোগ্য নেতৃবৃন্দ সেখানে গোলমাল পাকানোর মত কোন রাজনৈতিক ইস্যু খুঁজে না পেয়ে অবশেষে সাম্প্রদায়িকতার সহজ ও উত্তেজক পথটি অবলম্বন করলেন। এই পথটি অবশ্য বাতলে দিয়েছিলেন তাদের সংগঠনের মূল ভারতীয় নায়কেরা। কিন্তু সে পথেও বেশি দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। অবশেষে সুযোগ এসে গেল ১৯৩৭ সালে, যখন ব্রিটিশ রাজ ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আইন জারি করে শাসন কার্যে ভারতীয়দের সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

হায়দারাবাদকে ঘিরে থাকা তিনটি রাজ্যেই কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করলো। তারাই হায়দারাবাদের অভ্যন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে শুরু করলো। প্রথমেই তারা ব্যবহার করলো 'সত্যাগ্রহ' নামক অস্ত্রটি। কিন্তু সত্যাগ্রহ করার মত রাজনৈতিক ইস্যু এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরাই হায়দারাবাদে ছিল না। ফলে হায়দারাবাদ কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, এবং আর্য সমাজীগণ একত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিল, এবং একাজে দলে দলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা হায়দারাবাদে অনুপ্রবেশ করতে লাগলো।

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেন তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা কে, এম মুন্সী। তিনি বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসবক সংগ্রহ করে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে হায়দারাবাদে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করলেন। এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ছিল তারা এক একটি ফুলের মালা পরে শহরের কোন স্থানে আইন অমান্য করবে এবং গ্রেফতার বরণ করবে। তাদের বোঝান হয়েছিল যে নিজামের কারাগারে তারা ভালই থাকবে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে, তাদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে।

নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করা হলেও, সত্যাগ্রহীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম জনগণ। এভাবেই শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি একদিন বিনষ্ট করতে সক্ষম হল হিন্দু নেতৃবর্গ। মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন 'ইত্তেহাদ' নেতৃবৃন্দ সত্যাগ্রহীদের আসল মতলব সম্পর্কে মুসলিম জনগনকে হুশিয়ার করতে লাগলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়, সুসাহিত্যিক মন্ত্রী, কে এম মুন্সী এই হুশিয়ারীকে সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়ে কল্পিত মুসলিম অত্যাচারের কাহিনী তৈরি করে তার কলম ছুটাতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ভারতের স্বাধীনতা যখন দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসে গেল তখন রামানন্দ তীর্থ নামক জনৈক কংগ্রেস নেতা হায়দারাবাদকে ভারত ভুক্ত করার মানসে ধর্মকে অবলম্বন করে নতুন ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। হায়দারাবাদ সরকারও ধর পাকড় শুরু করলেন। অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেল। সেখানে বসে এ্যাকশন কমিটি তৈরি হল। তারা দলে দলে হায়দারাবাদে ঢুকে পড়ে লুটতরাজ, মুসলমান হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং সীমান্তরক্ষীদের সাথে খন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হল। (অনেকটা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে দখল করার সাথে এই ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।) ১৯৪৮ সালের ২৯ নভেম্বর টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় লেখা হল বিদ্রোহীরা হায়দারাবাদের ১৭৫টি পুলিশ ফাঁড়ির উপর আক্রমণ করেছে, ১২০টি স্থানে রেললাইন উপড়ে ফেলেছে, ৬১৫টি কাষ্টমস ও পুলিশ ঘাঁটি ধ্বংস করেছে।

www.nagorikpathagar.org

ইত্তেহাদুল মুসলেমীন গঠিত

সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত হায়দারাবাদের হিন্দু সংগঠনগুলির সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, হায়দারাবাদের মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত না হয়ে উপায় ছিল না। হায়দারাবাদের মুসলমান গোষ্ঠী সংখ্যালঘু হলেও নিজেদের কখনও দূর্বল জ্ঞান করেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল হায়দারাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় যেভাবে ভারতীয় হিন্দু মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তাতে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। অতএব নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, ভারতের কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ বাগ্মী বাহাদুর ইয়ার জং এর নেতৃত্বে গঠিত হল ইত্তেহাদুল মুসলেমীন অর্থাৎ মুসলিম ঐক্য, যা সংক্ষেপে 'ইত্তেহাদ' নামে পরিচিত।

বাহাদুর ইয়ার জং এর গতিশীল নেতৃত্বে হায়দারাবাদের মুসলিম সমাজে যখন প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিতে শুরু করেছিল ঠিক সেই সময় আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। সমগ্র হায়দারাবাদ শোকে নিথর হয়ে গিয়েছিল সেদিন। জনতার এমন প্রকাশ্য শোক বিহ্বলতা অতীতে আর কখনো দেখা যায় নি। হায়দারাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাহাদুর ইয়ার জং-এর মৃত্যুতে।

বাহাদুর ইয়ার জং-এর মৃত্যুর পর কাসিম রিজভী ইত্তেহাদুল মুসলেমীনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। হায়দারাবাদের পরিস্থিতি তখন অনেক বেশি অস্থির ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তাদের সামনে প্রধান সমস্যা ভারত ভুক্তির সমস্যা। সারাদেশে বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণ উত্তেজনায় টগবগ করছে, যে কোন মূল্যে হায়দারাবাদের ভারত ভুক্তি ঠেকাতে হবে। এদিকে কংগ্রেসী চরেরা সীমান্ত পার হয়ে এসে বর্গীর হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে। দু'হাজার মাইল ব্যাপী সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সন্ত্রাসীরা ভিতরে ঢুকে দেশে বিশৃংখলা, লুট, খুন, অগ্নি সংযোগ ঘটাতে লাগলো। দেশের ভিতরের কিছু কিছু মানুষও

www.nagorikpathagar.org

বাইরের মদদ পুষ্ট হয়ে সন্ত্রাসীদের অন্তর্ঘাত কার্যকলাপে সাহায্য করতে লাগলো। রামানন্দ তীর্থ, সীমান্ত এলাকায় ফ্রী জোন ঘোষণা করে ভারতকে স্বীকৃতি দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্টরা এক হয়ে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের নামে দেশে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করলো; যা ইতিহাসে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ নামে কুখ্যাত হয়ে আছে।

পরিস্থিতি এমনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল যে পুলিশ দিয়ে ঠেকানো সম্ভব হলোনা। বিদ্রোহীদের হাতে তখন ভারী যুদ্ধাস্ত্র। তারা একের পর এক গ্রাম দখল করে সেখান থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে লাগলো। খাজনা আদায় করতে লাগলো। এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার সেনাবাহিনী তলব করলেন। সেখানেও দেখা গেল, পুলিশের মত সেনাবাহিনীরও অস্ত্র সংকট রয়েছে। কারণ বিদ্রোহীদের হাতে ছিল অনেক উন্নত অস্ত্রশস্ত্র যা পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে সরবরাহ করা হচ্ছিল।

এহেন পরিস্থিতিতে ইত্তেহাদ নেতৃত্ব ঠিক করলেন, আক্রান্ত মুসলিম জনগণকে সংগঠিত করে, আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাদের প্রতিরোধ বাহিনী রূপে গড়ে তুলতে হবে। তারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে জনগণকে আত্মরক্ষায় উদ্বদ্ধ করতে লাগলেন এবং তাদের সংগঠিত করে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। কাসিম রিজভী কলেজ ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যাদের নাম রাখা হল রেজাকার বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। দেখতে দেখতে ঝড়ের দ্রুততায় রেজাকার বাহিনীতে যোগদানের জন্য জনগণ এগিয়ে আসতে লাগলো। সীমান্ত এলাকায় তারা কৃতিত্বপূর্ণ প্রতিরোধ বৃহ্যরচনা করতেও সক্ষম হল। পৃথিবীব্যাপী রেজাকার বাহিনীর নাম ছড়িয়ে পড়লো, সেই সাথে কাসিম রিজভীরও সুনাম। কিন্তু মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় দক্ষ ও কুশলী ভারতীয় প্রচার মাধ্যম রেজাকার বাহিনীর নামে বানোয়াট গল্প তৈরি করে রং চড়িয়ে প্রচার করতে লাগলো তাদের খুন, লুট, আর অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী। এ ব্যাপারে 'হিন্দুস্তান টাইমস' ছিল অগ্রগামী। তাদের স্বভাব সুলভ প্রচারে আতংক ছড়াতে লাগলো এই বলে যে; ভারত হায়দারাবাদ আক্রমণ করলে রেজাকার বাহিনী হিন্দুদের কচুকাটা করবে। সেই ভয়ে অনেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালিয়ে গেল। ভারত তখন প্রচার করতে লাগলো যে, হায়দারাবাদে হিন্দুদের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই। এই ভাবে সংগঠিত

www.nagorikpathagar.org

অপপ্রচার চালিয়ে ভারত, হায়দারাবাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হলো। তাদের প্রচারের বাড়াবাড়ির ফলে দেশবিদেশের সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকরা হায়দারাবাদে ছুটে এলেন। কিন্তু তারা যখন ভারতীয় প্রচারের সত্যতা খুঁজে না পেয়ে দেশে ফিরে যথার্থ রিপোর্ট প্রকাশ করলেন, তখন সভ্যতার এবং সৎ সাংবাদিকতার সমস্ত গন্ডী অতিক্রম করে ভারতীয় সংবাদপত্র নির্লজ্জ ভাবে তাদের নামে দূর্নাম রটিয়ে প্রচার করতে লাগলো, ইউরোপ আমেরিকার ঐ সব সাংবাদিকেরা হায়দারাবাদ সরকারের কাছ থেকে প্রচুর ঘুষ খেয়েছে।

যাই হোক, কাসিম রিজভীর নেতৃত্বে ২ লক্ষ রেজাকার বাহিনী এবং প্রায় ৯ লক্ষ ইত্তেহাদুল মুসলেমিনের জানবাজ সদস্য, সমবেতভাবে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং সেই সাথে ভারতীয় সেনা অনুপ্রবেশ স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। যার ফলে ভারত হায়দারাবাদের সাথে একটি 'ষ্ট্যান্ডষ্টীল' চুক্তি করতে বাধ্য হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য প্রাক্তন গণপূর্ত মন্ত্রী এবং প্রখ্যাত স্থপতি নওয়াব ইয়ার জংকে দিল্লীতে হায়দারাবাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। অপরপক্ষে ভারত সরকার গুজরাটি রাজনীতিবিদ, লেখক এবং বম্বের এককালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি এক সময় হায়দারাবাদের আভ্যন্তরীন গোলযোগের মূল ইন্ধন দাতা রূপে পরিচিত ছিলেন, সেই কে এম মুন্সীকে হায়দারাবাদে ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, শতাব্দীব্যাপী যে ভারতীয় সৈন্য সেকেন্দ্রাবাদে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল, রেজাকারদের মারের ভয়ে, সেই বাহিনীকে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য হলেও ভারতে সরিয়ে নেয়া হল। চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী ছতরী হায়দারাবাদ ত্যাগ করলেন, এবং তাঁর স্থলে মীর লায়েক আলি সদর-ই-আজম বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। এই ষ্ট্যান্ডষ্টীল চুক্তির মাধ্যমেও ভারত হায়দারাবাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল।

দূর্জনের যেমন ছলের অভাব হয় না, ভারতেরও তেমনি চুক্তি ভঙ্গ করতে ছলনার অভাব হয়নি। ৪৭-এর দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে, রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ হিসাবে পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫০ কোটি টাকা ভারত পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে সদ্যোজাত পাকিস্তান নিদারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হয়ে, অস্তিত্ব হারাতে বসেছিল। পাকিস্তানের সেই দুঃসময়ে হায়দারাবাদ

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তানকে ২০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানকে ঋণদানের ঘটনাটিকে ভারত চুক্তি খেলাপের অজুহাত হিসাবে খাড়া করে ভারত হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে অবরোধ প্রথা আরোপ করে। ডেকান এয়ারওয়েজের বিমানকে হায়দারাবাদ হয়ে বম্বে, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, দিল্লী চলাচলে বাধা দেয়া হয়। হায়দারাবাদ রেলওয়ের গ্র্যান্ড ট্রাংক এক্সপ্রেসকে ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। ভারতের সাথে টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। শুধু তাই নয় হায়দারাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি কে এম মুন্সী সমস্ত কুটনৈতিক ভব্যতা লংঘন করে হায়দারাবাদের সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিয়মিত সফরের মাধ্যমে জনগণকে ভারতের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। তিনি বিজয় ওয়াড়ায় প্রকাশ্যে বলেন, 'হায়দারাবাদ রক্তে-মাংসে ভারতের সাথে মিশে আছে। দু'দেশের জনগন এক ও অভিন্ন। ভারত বিশ্বের তৃতীয় সামরিক শক্তি। সুতরাং অচিরেই সামরিক অভিযান চালিয়ে ভারত হায়দারাবাদ দখল করে নেবে।

হায়দারাবাদের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেননের সাথে এবং সর্দার প্যাটেলের সাথে বহুবার আলোচনায় বসলেন। কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না। হায়দারাবাদ প্রতিনিধি ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে সমস্যা সমাধানের আবেদন জানালেন। মাউন্টব্যাটেন মীরলায়েক আলির সাথে ৫ ঘন্টা ব্যাপী আলোচনার পর ভীতি প্রদর্শন করে বললেন যে,"তিনি কয়েকদিন পরেই ভারত ত্যাগ করে চলে যাবেন। সুতরাং ভারত যদি হায়দারাবাদে সেনা অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে হায়দারাবাদ সেনাবাহিনী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।" মীর লায়েক আলি মাউন্ট ব্যাটেনের কথার জবাবে বললেন, "একথা ঠিক যে হায়দারাবাদ সেনাবাহিনীর অবস্থান আমাদের বিজয়ের অনুকূলে নয়, তথাপি আমি বলবো, হায়দারাবাদের রাষ্ট্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতের সাথে মিশে যাওয়া, আমাদের জন্য দশগুণ নীচতার কাজ হবে"। অবশেষে ভারতের সাথে হায়দারাবাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ভারত হায়দারাবাদ দখলের সমস্ত পরিকল্পনা শেষ করে সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলো।

www.nagorikpathagar.org

এলো সেই বিড়ম্বিত দিন

দিল কী বিরানী কা কেয়া মজকূর হ্যায়
ইয়েহ্ নগর সওমর্তবা লুটা গ্যায়া।
(মীর)

আমার উজাড় হৃদয়ের কথা কি আর বলবো, এই নগরীতো শতবার লুণ্ঠিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নতুন দিল্লীর সেনা ছাউনিতে সভা ডেকে হায়দারাবাদে সেনা অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার ই, এন গোর্দাদ, জি-এস-ও সাউদার্ণ কমাণ্ড এর উপর আক্রমণ প্ল্যান তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হল। তাঁকে দেয়া হল ঃ

১। একটি আমার্ড ব্রিগেড।
২। ১৭ ডোগরা রেজিমেন্টের থার্ড-ক্যাভালরি ও নবম ব্যার্টালিয়ান
৩। নবম ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ানসহ আরও তিনটি ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ান।
৪। তিনটি অতিরিক্ত ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ান
৫। তিন রেজিমেন্ট ফিল্ড আর্টিলারী ও একটি এ্যান্টি ট্যাংক রেজিমেন্ট
৬। ১৮ ক্যাভালরি, সার্ভিস মেইনটেন্যান্স ট্রুপস।
৭। বিপুল সংখ্যক 'শেরম্যান' ও 'ষ্টুয়ার্ট' ট্যাংক
৮। এবং রয়্যাল ইন্ডিয়ান বিমান বাহিনী।

এ যেন মশা মারতে কামান দাগা। ভারতীয়দের ধারণা অনুযায়ীই হায়দারাবাদ বাহিনীর ছিল মাত্র ঃ

১। ২২ হাজার সেনা।
২। ৮টি ২৫ পাউন্ডের কামান।
৩। ৩ রেজিমেন্ট সেনা যানবাহন।
৪। ১০ হাজার পুলিশ ও কাষ্টমস বাহিনী এবং কিছু বেসরকারী রেজাকার বাহিনী।

www.nagorikpathagar.org

তাদের সেনাবাহিনীতে কোন ট্যাংক বা বিমান বিধ্বংসী কামান ছিল না, এবং বিমান বাহিনীও ছিল না।

এরকম একটি দূর্বল শক্তির বিরুদ্ধে বিপুল সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের বম্বে অধিবেশনে সদম্ভে ঘোষণা করলেন-"হায়দারাবাদের কাছে এখন দু'টি পথ খোলা আছে, 'হয় পথে ফিরে আসা, নয়তো যুদ্ধ"। নেহেরুর এই অসংবৃত উক্তি শুনে তাঁর দলের অনেকেই উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ তারা ভেবেছিলেন, নেহেরুর এই ফ্যাসিষ্ট উক্তির ফলে বিশ্ববাসী জেনে যাবে যে, ভারত সেনাশক্তি বলে হায়দারাবাদ দখলের চেষ্টা করছে। তাঁরা নেহেরুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, তাদের নীতি হবে হায়দারাবাদে সেনা অভিযানের বিষয়টি চাপা দিয়ে, সেখানে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য পুলিশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে প্রচার করা।

আজও ভারত হায়দারাবাদ দখলকে পুলিশি অভিযান বা পুলিশ এ্যাকশন বলে প্রচার করে বিশ্বকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে।

যে অভিযান চালানোর জন্য ১জন লেফটেন্যান্ট জেনারেল, ৩ জন মেজর জেনারেল, সম্পূর্ণ আর্মড ডিভিশন, ট্যাংক, বিমান বাহিনী ব্যবহার করা হয়েছিল। একটি অস্ত্রবলহীন রাজ্যের বিরুদ্ধে পদাতিক বাহিনী, ট্যাংক, বিমান বাহিনীর সহায়তায় সাঁড়াশী আক্রমণ পরিচালনা করে তাকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হয়েছিল। আত্মসমর্পনের পর, বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে যেখানে ভারতীয় সেনাশাসন কায়েম করা হয়েছিল, তেমন একটি প্রত্যক্ষ সেনা আগ্রাসন কে ভারত 'পুলিশ এ্যাকশন' নাম দিয়ে বিশ্ববিবেককে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। সেদিন জাতিসংঘ এবং নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ দায়ের করেও, সুবিচার পায়নি ক্ষুদ্রশক্তি হায়দারাবাদ। মহাকবি ইকবাল বলেছিলেন "পৃথিবীতে যে শক্তিমান, কেবল তারই পৃথিবী ভোগ করার অধিকার আছে। দুনিয়াতে দূর্বলের কোন স্থান নেই"। পৃথিবী যে পশুশক্তির কাছে পদানত সেই কথার যথার্থতা প্রমাণিত হল, ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখলের মধ্য দিয়ে। সে দিন পৃথিবীর কোন দেশ, এমন কি মুসলিম দেশগুলোও হায়দারাবাদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসেনি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয়, ভারতের পাশের আর একটি ক্ষুদ্র দেশ পাকিস্তান, পেটে পাথর বেঁধে আজ যে ব্যয়বহুল পারমানবিক বোমা বিষ্ফোরণ ঘটিয়েছে, বিবেকের কাছে সেটি অনুমোদন যোগ্য মনে না

www.nagorikpathagar.org

হলেও, পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ দূর্বলের ক্ষেত্রে বিশ্ববিবেক যে ঘুমিয়ে থাকে সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বহুবার।

১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই হায়দারাবাদ আক্রমণের সকল পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং অনুশীলন ভারত চূড়ান্ত করে ফেলে। সিদ্ধান্ত হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাউদার্ণ কমাণ্ড হায়দারাবাদে দ্বি-মুখী সাঁড়াশী আক্রমণ পরিচালনা করবে। মূল বাহিনী হায়দারাবাদ থেকে ১৮৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শোলাপুর পথ ধরে এগিয়ে যাবে, অন্যটি হায়দারাবাদ সীমান্ত থেকে ১৬০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বিজয়ওয়াড়া পথে হায়দারাবাদে প্রবেশ করবে। পরিকল্পিত অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হল, ডিভিশন কমাণ্ডার হিসেবে জয়ন্তনাথ চৌধুরী (জে, এন চৌধুরী) এবং আর্মড ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে ব্রিগেডিয়ার এস ডি বর্মার উপর।

১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় বাহিনী হায়দারাবাদ অভিযান শুরু করে। উক্ত দিনটি বেছে নেয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য হয়তো এই ছিল যে, মাত্র দু'দিন আগে, অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না ইন্তেকাল করেছেন। সমগ্র পাকিস্তান তখন শোকে মূহ্যমান। ভারতীয় বাহিনী ধারণা করেছিল এই সুযোগে হায়দারাবাদ আক্রমণ করলে পাকিস্তানের তরফ থেকে কোন বাধা আসার সুযোগ নেই। তাদের সেই ধারণা ফলপ্রসূও হয়েছিল। ভারতের হায়দারাবাদ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তান সেদিন কোন পদক্ষেপই নিতে পারেনি। হায়দারাবাদের প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি ভারতীয় দুরভিসন্ধি অনুমান করে জিন্না-সাহেবের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন, কিন্তু জিন্না সাহেব তখন মৃত্যু শয্যায় বিধায় তাঁকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল।

ভারতীয় বাহিনী হায়দারাবাদে সেনা অভিযানের নামকরণ করেছিল "অপারেশন পোলো"। প্রথম অপারেশন শুরু হয় পশ্চিমের নলদূর্গ এলাকা দিয়ে। অপর বাহিনী হায়দারাবাদে প্রবেশ করে তালমুদ এলাকা দিয়ে। প্রথম দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য নিহত হয় ৭ জন এবং আহতের সংখ্যা ৯ জন, যার মধ্যে পরে আর একজন মারা যায়। অপর পক্ষে হায়দারাবাদের সৈন্য শহীদ হয় ৬৩২ জন, আহত হয় ১৪ জন, এবং বন্দীত্ব বরণ করে ২০০ জন। হায়দারাবাদের পক্ষে সেনা পরিচালনা করেন জেনারেল সাঈদ আহমেদ

www.nagorikpathagar.org

আল ইদরুস। একটি অস্ত্রহীন সেনাবাহিনীর পক্ষে পুর্ণাঙ্গ সুসজ্জিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর গতিরোধ করা যে সম্ভব ছিল না, তা প্রথম দিনের যুদ্ধেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। একরকম বিনা বাধায় তুলজাপুর, উমরগাঁ, আওরঙ্গবাদ, কোদাদ প্রভৃতি অঞ্চলের পতন ঘটতে লাগলো। একইভাবে দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসা ভারতীয় বাহিনীর হাতে জালনা প্রভৃতি অঞ্চলের পতন ঘটলো। এ ভাবেই ভারতীয় বাহিনী ধীরে ধীরে রাজধানীয় দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর, এবং মহীশুর অধিপতি টিপু সুলতানের সেনাপতি মীর সাদিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যেমন বাংলা ও মহীশুরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়েছিল, তেমনি; একইভাবে নিজামের সেনাপতি আল ইদরুসের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই হায়দারাবাদের পতনও তরান্বিত হয়েছিল।

পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসা ভারতীয় বাহিনীর আশংকা ছিল যে, বোরি নদীর উপর নির্মিত সংকীর্ণ সেতুটি হায়দারাবাদ বাহিনী নিশ্চিত ভাবেই আগে ভাগে উড়িয়ে দেবে, যার ফলে নদী পার হয়ে এগিয়ে যাওয়া ভারতীয় বাহিনীর জন্য কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে তারা দেখলো বোরি নদীর সেতুটি অক্ষত আছে। সুতরাং সীমান্ত থেকে ১৯ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে নলদূর্গ দখল করতে ভারতীয় বাহিনীকে মাত্র ২টি বুলেট খরচ করতে হয়েছিল।

দক্ষিণ পুর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসা ভারতীয় বাহিনী তালমুদ অঞ্চলে প্রবেশের পথে, হায়দারাবাদ বাহিনীর কাছ থেকে প্রবল বাধার আশংকা করেছিল। কারণ এই পথে ১৮ কিঃ মিঃ রাস্তাই ছিল সংকীর্ণ পাহাড় ও ঘন বনাঞ্চল ঘেরা দূর্গম পথ, যা হায়দারাবাদী বাহিনীর জন্য ওৎ পেতে শত্রু সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মোক্ষম স্থান বিবেচিত হতে পারে। অনুরূপ আশংকায় ভারতীয় বাহিনী এতদ অঞ্চলে বিমান বাহিনীর ছত্রছায়ায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু পরে তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো যে, এই দূর্গম অঞ্চলটি সম্পুর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, হায়দারাবাদ বাহিনী সেখানে কোন সেনা সমাবেশই করেনি।

যুদ্ধের এই বেহাল অবস্থা দেখে প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি, যুদ্ধের তদারকির দায়িত্ব কিছুটা নিজ কাঁধে নেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন সব দিকেই প্রায় ধ্বস নামতে শুরু করেছে। তিনি আর্মি কন্ট্রোলরুমে বসে

www.nagorikpathagar.org

জানতে পারলেন যে তার বাহিনীতে প্রচলিত 'কোড' এত পুরোনো যে ভারতীয় বাহিনী তাদের সেনা চলাচলের সব খবরই আগেভাগে জেনে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি সেনা সদরে দাঁড়িয়ে শুনলেন কল্যাণী-বিদর পথে ভারতীয়-ট্যাংক ও সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী সামনে টাঙানো সেনাবাহিনী সদরের ম্যাপটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঐ শহর দু'টির মধ্যে যোগাযোগের কোন পথই নেই। তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে সড়ক বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে টেলিফোনে কথা বলে জানতে পারলেন যে, ঐ স্থানে অতন্ত সুন্দর একটি পাকা সড়ক কয়েকদিন আগেই মাত্র উদ্বোধন করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় দেশীয় সেনাপ্রধানের সে খবরটিও জানা নেই। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভে দুঃখে বুক থাবড়াতে লাগলেন। এমতাবস্থায় নিজাম এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়েই সেনাপতি আল ইদরুসকে বরখাস্ত করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন, কিন্তু তখন সময় অনেক পার হয়ে গেছে। ওদিকে ভারতীয় সাউদার্ন কমান্ডের জিওসি, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহারাজ শ্রী রাজেন্দ্র সিংজী বেতার মারফত ঘনঘন মেজর জেনারেল আল ইদরুস কে অস্ত্র সমর্পনের আহ্বান জানাচ্ছেন। এমতাবস্থায় জাতিসংঘ থেকে খবর এল, হায়দারাবাদ সংক্রান্ত যে আলোচনা সভা ১৬ সেপ্টেম্বর হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তা ২০ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

আরও খবর এল ভারতীয় বাহিনী যে পথে এগিয়ে আসছে সে পথে মুসলমানদের জান, মাল, নারীর ইজ্জত ধ্বংস করে আসছে। তাদের নির্যাতন, লুণ্ঠন, অত্যাচার এমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল যে, ১৯৪৮ এর ২৬ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহেরু তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলকেও এক নোট লিখে বলেছিলেন, তিনি হায়দারাবাদে এত বেশি মুসলিম হত্যার বিবরণ পাচ্ছেন তাতে, তাঁর ধারণার ভিত কেঁপে গেছে। সেখানে মুসলমানদের সম্পদহানির খবরও ভয়াবহ। সুতরাং অতিসত্বর সেখানে তদন্ত টিম পাঠানো উচিত। পণ্ডিত সুন্দর লালের নেতৃত্বে একটি তদন্তটীম গঠন করাও হয়েছিল। কিন্তু, তদন্ত হলে মেজর জেনারেল চৌধুরীকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা হবে বলে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার প্যাটেল যুক্তি উত্থাপন করায় সেই তদন্ত টীম কাজ করতে পারেনি।

১৯৪৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৮ টায় প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি নিজাম প্যালেসে গিয়ে ৭ম নিজাম মীর ওসমান আলি খান এর সাথে দেখা করলেন। নিজাম হতাশার সুরে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন আমাদের সকল

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টাই তো ব্যর্থ হল।

পাকিস্তান নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

কোন মুসলিম দেশ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো না।

সিকিউরিটি কাউন্সিল এই আগ্রাসনের ব্যাপারে সভা ডাকার ব্যবস্থাও করল না।

আমাদের সেনা বাহিনীর উপরও কোন ভরসা নেই।

ভারতীয় বাহিনী ক্রমশ: রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। মৃত্যু বাড়ছে, নারী নির্যাতন চলছে, সম্পদ ধ্বংস লুট সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দেশবাসী আতংকগ্রস্ত।

এই মুহূর্তে আমাদের করনীয় কি?

প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি অকুতোভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন 'আলা হজরত, সমস্ত ঘটনা পরম্পরা মেনে নিয়েও বলছি, আত্মসমর্পনের চাইতে মৃত্যু শ্রেয়। স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণ করাকেই আমি স্বাগত জানাবো'।

নিজাম শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলির উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তিনি 'ভারতীয় প্রতিনিধি কে এম মুন্সীর পরামর্শে আত্মসমর্পনের পথই বেছে নিয়েছিলেন। ভগ্নহৃদয় প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি নিজামের ইচ্ছানুসারে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর এক বেতার ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন 'ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তার সরকার পদত্যাগ করছে।

একই দিনে নিজাম ভারতীয় প্রতিনিধি কে এম মুন্সীর পরামর্শ অনুসারে, তারই খসড়াকৃত বেতার ভাষণে ভারতের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। তিনি বললেন ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে নেয়া হল। তিনি কে এম মুন্সীর পরামর্শে ভারতের গ্রহণযোগ্য লোকদের নিয়ে একটি মন্ত্রী সভার নামও ঘোষণা করলেন, যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেরারের যুবরাজ। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বাসঘাতক সেনানায়ক আল ইদরুস; নওয়াব দীন ইয়ার জং, জি রামাচারী, পান্না লাল পিট্টি, অরবিন্দ আয়েঙ্গার, আবুল হাসান সৈয়দ প্রমুখ ভারত পন্থীরা। তেলেঙ্গানা সশস্ত্র বিদ্রোহের নায়ক, রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি রামানন্দ তীর্থকেও কারামুক্ত করে দেবার কথা ঘোষণা করা হল।

www.nagorikpathagar.org

আত্মসমর্পনের সেই কুখ্যাত দিন

১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হায়দারাবাদ বাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল আল ইদরুস রাজধানী হায়দারাবাদের বাইরে, ভারতীয় বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জে, এন চৌধুরীর কাছে অস্ত্র সমর্পন করেন।

অস্ত্র সমর্পনের সেই অনুষ্ঠানে আল ইদরুস ছাড়া হায়দারাবাদের আর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

সেনা আত্মসমর্পনের পর নিজাম বাহাদুর, ব্যক্তিগত দূত হিসাবে জুলকদর জং, আবুল হাসান সৈয়দ, আলি ইয়ার জং প্রমুখকে মেজর জেনারেল জে, এন চৌধুরীর কাছে পাঠালেন এই আশায় যে, তিনি যেন, তাঁদেরই প্রতিনিধি কে এম মুন্সীর নির্দেশে গঠিত নতুন বেসামরিক মন্ত্রী সভাকে স্বীকৃতি দান করেন। জেনারেল চৌধুরী সকলকে বিস্মিত করে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, কোন মন্ত্রীসভা নয়, হায়দারাবাদে সামরিক শাসন জারি করা হবে এবং সরকারের দায়িত্বভার তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করবেন।

মহামান্য নিজাম ভারতীয় সেনাপতির কথা শুনে বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলেন, পাশে দাঁড়ানো পুরোনো সহকর্মী মীর লায়েক আলিকে সম্বোধন করে বললেন -

মুন্সীর সাথে তো আমার এরকম চুক্তি হয়নি।

মীর লায়েক আলি বিনয়ের সাথে বললেন। 'আলা হজরত, পরাজিতের সাথে বিজয়ীর কোন চুক্তি হয় না, শুধু তাকে নির্দেশ মান্য করতে বলা হয়।'

এরপর ভারতীয় নির্দেশে, জেনারেল, জে এন চৌধুরীকে সামরিক গভর্ণর, এবং ডি, এস বাখলেকে প্রধান বে-সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করে ৫ সদস্যের সামরিক মন্ত্রীসভা হায়দারাবাদের শাসন ভার গ্রহণ করলো।

www.nagorikpathagar.org

নতুন সামরিক সরকার দেশে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালালো। তারা কাসেম রিজভীর ২ লক্ষ রাজাকার বাহিনীকে নির্মূল করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি ও কাসেম রিজভী গৃহবন্দী হলেন। সাত পুরুষের মহামান্য নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদের টেলিযোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ঔদ্ধত্যও দেখালো ভারতীয় শাসকরা। মীর লায়েক আলি গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে সপরিবারে বম্বে হয়ে করাচী চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় আগ্রাসী শাসকরা হায়দারাবাদের বীর সন্তান কাসেম রিজভীকে পরে ত্রিমূল ঘেরী কারাগারে বন্দী করে রাখে।

১৯৪৮ সালে স্বাধীন হায়দারাবাদ দখলের পর ধূর্ত ভারতীয় রাজনীতিবিদরা, বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখার কৌশল হিসাবে মহামান্য নিজামকে কিছু দিনের জন্য রাজপ্রমুখ মর্যাদায় ভূষিত করলেও, নিজাম মীর ওসমান আলি খান, আসফজাই রাজবংশের ৭ম এবং শেষ প্রদীপ হিসাবেই একদিন নিভে গেলেন। আজ সেই নিজামও নেই, সেই হায়দারাবাদও নেই। শকুনের দল তার দেহটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। হায়দারাবাদের বিশাল রাজ্য এখন অন্ধ্র প্রদেশ। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের সাথে বিলীন করে দেয়া হয়েছে। সেই বিখ্যাত চার মিনার, মক্কা মসজিদ, জামে মসজিদ, নিজাম প্যালেস হয়তো আছে, কিন্তু দিল্লীর উন্নত শির লাল কেল্লার মতই অধমদের নোংরা কর্দমাক্ত পদভারে পিষ্ট হয়ে শ্রীহীন বিবর্ণ এবং লজ্জায় কুঁকড়ে আছে।

আসফজাহ বংশের শেষ প্রদীপ মীর ওসমান আলি খানের ভালবাসার সেই পংক্তিমালা আজও হয়তো হায়দারাবাদের আকাশে বাতাসে হাহাকার করে বলছে-

'নহী মুসকীণ কে ছুটে, দেখ ওসমান
মুহব্বত হো গয়ী, মুল্‌কে ডেকান সে"

তোমার পক্ষে সম্ভব নয় হে ওসমান, যে তুমি ডেকান-এর ভালবাসা পরিত্যাগ কর।

জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এবং হতাশা নিয়ে ৭ম এবং শেষ নিজাম মীর ওসমান আলি খান ১৯৬৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১টা ২২ মিঃ এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু তার অতৃপ্ত আত্মা হয়তো

www.nagorikpathagar.org

আজও তার সাধের হায়দারাবাদ রাজ্যকে খুঁজে ফিরছে। স্বাধীনতা গ্রাস করার সাথে সাথে আগ্রাসী ভারতীয় শক্তি যে তাঁর প্রিয় হায়দারাবাদের চিহ্নটুকুও মুছে দিয়েছে, সেকথা আজ তাকে কে বলে দেবে।

হায়দারাবাদ সেদিন পশুশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ৫০ বছর পর আজও হায়দারাবাদের বুকে কান রাখলেই হৃৎপিন্ডের আওয়াজের সাথে জাতীয় সংগীতের সেই গুঞ্জন শোনা যাবে।

"তা বাদ খালিক-ই আলম ইয়েহ্ রিয়াসাৎ রাখ্যে
তুবাকো ওসমান বা-সাদ আজলাল সালামাত রাখ্যে।
May Allah Preserve this state till eternity and
May Allah Keep Osmany in all his grandeur"

www.nagorikpathagar.org

আজকের বাংলাদেশ

উপনিবেশবাদীদের চক্রান্তে হায়দারাবাদের সেই ঔজ্জ্বল্য নিভে গেছে। ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দ্বিমুখী সেনা অভিযান চালিয়ে ভারত স্বাধীন হায়দারাবাদ গ্রাস করে নেয়। শুধুই কি হায়দারাবাদ। স্বাধীন দেশীয় রাজ্য জুনাগড়, মানভাদর, গোয়া ও সিকিম একই ভাবে ছলে বলে কৌশলে, ভারতের উদরে চলে গেছে। কোথাও সেনা হামলা চালিয়েছে। কোথাও দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, যুবশ্রেণী, এমনকি নানান পেশাজীবির মধ্যে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর সৃষ্টি করে, তাদের অর্থ, পদ, পদক ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে, দেশের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা অরাজকতা সৃষ্টি করে, আপন উদ্দেশ্য হাসিল করেছে। অর্থাৎ সেই দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছে, কিংবা দেশটি দখল করে নিয়েছে। ভারত কর্তৃক সিকিম দখল ও আগ্রাসনের আর একটি জলন্ত নিদর্শন। ১৯৪৭ এর পর থেকেই ভারত, সিকিমে কয়েকটি পোষ্য রাজনৈতিক দল পুষে আসছিল। ভারতের পোষ্য এই সব রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রভূর নির্দেশে দেশে বিশৃংঙ্খলা, রাজনৈতিক হানাহানি, বোমা বিষ্ফোরণ, হরতালসহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এমনই অবনতি ঘটায় যে, সে দেশের ধর্মরাজা চোগিয়ালের পক্ষে দেশ শাসন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তিনি ভারতের পরামর্শে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে দেশে নির্বাচন দিয়ে শাসন ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। নির্বাচিত সেই সরকার প্রধান, কাজী লেন্দুপ দর্জি ১৯৭৫ সালের ১০ এপ্রিল সিকিম জাতীয় পরিষদে এক প্রস্তাব পাশ করে চেগিয়াল-এর (রাজা) পদ বিলোপ করে, এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৫ সালের ২৬ এপ্রিল ভারতীয় সংবিধানের ৩৮তম সংশোধনী পাশ করে ভারত স্বাধীন সিকিম রাজ্যকে তার ২২তম প্রদেশ হিসাবে আত্মসাৎ করে ফেলে। সংসদীয় গণতন্ত্রই যে দেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষা কবচ নয়, সিকিমই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়াও স্বাধীন শ্রীলংকায় বিদ্রোহ সৃষ্টিকারী তামিল টাইগার বাহিনী এবং তাদের নেতা প্রভাকরণ ভারতেরই সৃষ্টি।

www.nagorikpathagar.org

ভারতের সৃষ্ট গফফার খান, ওয়ালী খান এবং তাদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পাখতুনিস্থানের দাবী তুলে সে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে স্বাধীন আফগানিস্তানকে ভারতের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। ভৌগলিক অসংলগ্নতা এবং যোগাযোগের অসুবিধার কারণে তাদের সে চক্রান্ত সফল হয়নি। তবে আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখার জন্য ভারত কম দায়ী নয়।

পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য প্রথমে জি এম সৈয়দের নেতৃত্বে 'জিয়ে সিন্ধ' আন্দোলন শুরু করেছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের হৃৎপিন্ড, করাচী বন্দরকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অসৎ উদ্দেশ্যে মুত্তাহিদা কওমী মজহাব 'এম কিউ এম' নামক পার্টির মাধ্যমে সে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে চলেছে। এই দলটির নেতা আলতাফ হোসেন, ভারতীয় পয়সায় লন্ডনে বেশ আরাম আয়েশে দিন গুজরান করছে বলে সেদেশের জনগণ বিশ্বাস করে।

ভারত শান্তিপ্রিয় মালদ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করেছিল। কাশ্মীরের ৬০ লাখ নিরস্ত্র মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার অস্বীকার করে, ৬ লক্ষ সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যের বুটের তলায় তাদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে দীর্ঘদিন ধরে দাবিয়ে রেখেছে।

অর্থাৎ সার্বিকভাবে বিচার করলে ভারতকে একটি শান্তিপ্রিয় বন্ধুবৎসল, হিতৈষী, সৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভাবার কোন কারণ নেই। ভারত তার আচরণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভাল আচরণ কখনও করেনি বরং সততই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে।

যে কারণে চীনের সাথে তার সম্পর্ক সুস্থ নয়, বিশ্বের প্রাচীনতম হিন্দু রাষ্ট্র হয়েও নেপাল নিরাপদ মনে করছে না নিজেকে, ভুটানকে পায়ের তলে দাবিয়ে রেখেছে, পাকিস্তানের সাথে তিন বার প্রত্যক্ষ যুদ্ধসহ প্রতিনিয়ত গোলাগুলি বিনিময় হচ্ছে, শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি সদা উত্তপ্ত। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙ্গে ৫৫,৮১৩ বর্গমাইল এলাকা বিস্তৃত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যার তিন দিকই প্রায় ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে ঘেরা, একদিকে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর, এখানে টহল দিচ্ছে শক্তিশালী ভারতীয় ব্লু-ওয়াটার নেভী। এরকম একটা বৈরী পরিবেশে বসবাস করে বাংলাদেশকে তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ভারত কোনদিনই তার আশে পাশে ভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেনা। ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' নামক বইতে দক্ষিণ এশিয়া ব্যাপী হিন্দু সভ্যতার প্রভাব বলয় সৃষ্টির আবেগ আচ্ছন্ন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

বিখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীবি নিরোদ চৌধুরী এক তথ্য ফাঁস করে বলেছেন ৪৭ থেকে ৫০ সাল পর্যন্ত জওহরলাল নেহেরু ৩ বার পুলিশ এ্যাকশন করে হায়দারাবাদের মত বাংলাদেশ দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, জয় প্রকাশ নারায়ন সৈন্য ঢুকিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতীয় নেতারা বরাবরই অখন্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। ভারতীয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন "ভারত বিভাগ করতে হলে আমার মৃত দেহের উপর করতে হবে। যতই রক্তপাত হোক এক ইঞ্চি পাকিস্তানও আমি সমর্থন করবো না"। তিনি বললেন ঃ If India leads a blood bath, She shall have it.

ভারতের বিখ্যাত লেখক বিমলানন্দ শাসমল তাঁর 'ভারত কি করে ভাগ হল' বইতে লিখেছেন - 'গান্ধী বলেছিলেন "ভারত বিভাগ মানে 'ঈশ্বরের' অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। পাকিস্তানের জন্য এক ইঞ্চি জমি দেওয়াও ঠিক হবেনা"।

তিনি আরও লিখেছেন "মাউন্ট ব্যাটেন রাতারাতি পার্টিশন প্ল্যান তৈরি করলেন এবং নেহেরুও প্যাটেলকে দিয়ে তাদের সমর্থনে সেটি সই করিয়েও নিলেন। জিন্নার পাকিস্তানকে খর্ব করার জন্য বাঙলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করবার ব্যবস্থা রাখা হোল"। ভারতীয় নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন "পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনভাবেই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না, আজ হোক কাল হোক আমাদের সংগে তাদের মিলতেই হবে"।

যে ভারতীয় নেতারা অখণ্ড ভারত ছাড়া কিছু ভাবতেই পারেনি, সেই ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার আগ্রহ নিয়ে ছুটে এল কেন সেই উদ্দেশ্যটি সত্যই রহস্যে ঘেরা।

এই রহস্যের জট খুলে, প্রখ্যাত সাংবাদিক মাসুদুল হক তাঁর 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ', বইতে লিখেছেন "১৯৬২ সালের চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধে আইউব খানের ভূমিকায় পাকিস্তান সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ভারত। পাকিস্তানকে দূর্বল করার লক্ষ্যে সে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ওপর সে পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয়"।

ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক অশোক রায়না তাঁর ইনসাইড 'র' বইয়ের ৭ম অধ্যায়ে 'অপারেশন সিকিম' পর্যায় বর্ণনাকালে লিখেছেন ঃ- "অপারেশন বাংলাদেশ শেষ। একমাস পর একজন উর্দ্ধতন বেসামরিক কর্মকর্তা 'র' প্রধানের অফিসের বারান্দা দিয়ে হেঁটে সভাকক্ষের দরজার নিকটে এসে থামলেন। টোকা দেয়ার পূর্বেই তাঁকে সাদরে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। চারজন লোক নীরবে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। শান্ত নীরব পরিবেশ তপ্ত-চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তে, 'ভাল দেখিয়েছেন। (পাকিস্তান দ্বিখণ্ডীকরণ) কাজটা ভালভাবেই হয়েছে। এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বাকি চারজন বিস্মিত হয়ে ভেবেই পেলেন না। এরপর আবার কি? সিকিম জেন্টলম্যান সিকিম। দেখুন এটা নিয়ে কি করতে পারেন।"

সাংবাদিক মাসুদুল হক তাঁর "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' ও সি আইএ" বইতে আরও লিখেছেন "বাংলাদেশ একটা প্রকৃত স্বাধীন সাবভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠুক ভারত তা কখনও চায় না।"

১৯৭০ সালের ৩১ জানুয়ারী লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় ওয়াল্টার সোয়ার্জ লিখেছিলেন- "বাংলাদেশ ভারতীয় অস্ত্র এবং কুটনীতির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। বাংলাদেশ মুক্তির কাহিনী প্রায় পাঠ্যবই-এর অনুশীলনীর মতই চলেছিল এবং কুটনীতির প্রতিধাপ তদারকি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং। তিনি এমন সুকৌশল এবং সুক্ষ্মতার সাথে কাজটি পরিচালনা করেছিলেন যা নয়াদিল্লীর কুটনীতিতে সচরাচর দেখা যায় না।

এই সব মন্তব্য এবং পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল এক সূদুর প্রসারী দূরভিসন্ধি নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক শ্রী বিমলানন্দ শাসমল তাঁর 'ভারত কি করে ভাগ হল' বইতে লিখেছেন, "বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয়রা কৃতিত্বের দাবি করি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সেই জন্য এই সময়ে এশিয়ার মুক্তিসূর্য বলেও অভিহিত করা হতো। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

বিনীতভাবে বলতে চাই-যে লোকটির জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারলো তাঁর নাম মহাম্মদ আলি জিন্নাহ। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা জিন্নার আহ্বান অগ্রাহ্য করে যদি পাকিস্তানে যোগ না দিতেন এবং ভারতে যোগ দিতেন এবং তার দশ-বিশ বছর বাদে, যে কারণে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেন, অর্থাৎ ভাষা পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা বাঙালিরা কি ফুলের মালা দিয়ে পূজা করতাম, না রাস্তায় গুলি করে মারার দাবি জানাতাম? প্রায় একই কারণে শেখ আবদুল্লাহ্‌কে কত বছর কারাগারে থাকতে হয়েছিল, নিশ্চয় সে কথা কেউ ভোলেন নি। পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে, পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় যে অত্যাচার করেছিল, আমাদের ভারতবর্ষে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে ভারতবর্ষ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের চেয়ে বেশি না হোক কম অত্যাচার করতো না। মিজোনাগাদের উপর আমরা যে অত্যাচার করেছিলাম, পৃথিবীর লোক কোনদিন সে সংবাদ জানতে পারবেনা। ভারতের মত শক্তিশালী দেশের সংগে লড়াই করার জন্য ক্ষুদ্র পাকিস্তান বা পৃথিবীর কোনো দেশের কার্যকরী সাহায্য পূর্ববাংলার লোকেরা পেতেন না। ভাগ্যবশত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল বলেই সহজে স্বাধীন হতে পারলো- না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দূর অস্ত হয়ে থাকতো।" তিনি আরও লিখেছেন-

"আর একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমার মনে থেকে গেছে যার কোনো সদুত্তর আমি পাইনি। একথা সবাই জানেন, ভারতীয় সৈন্য পূর্ববাংলায় যেতে না পারলে পূর্ব বাংলা স্বাধীন করা যেত না। গোপনে যে ধরনের সাহায্য (বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের) দেওয়া হচ্ছিল তাতে একটা দেশকে স্বাধীন করা যায় না। পূর্ববাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী ভারতে এসে পড়ায় ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এই যুক্তিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত এই দাবী নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কার্যকরী কিছু করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পৃথিবীর কোন দেশই এ ব্যাপারে ভারতকে কিছু অর্থ ভিক্ষা ছাড়া আর কিছু করতে রাজি হলো না। সত্য হোক মিথ্যা হোক একথাও তখন অনেকে বলতেন যে এই লক্ষ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীর

www.nagorikpathagar.org

ভারতে আগমনও একটি ষড়যন্ত্রের ফল"। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একই ব্লুপ্রিন্ট হায়দারাবাদেও অনুসরণ করা হয়েছিল। হায়দারাবাদ দখলের পূর্বে সেখানেও নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগনের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে শরনার্থীদের ভারতে প্রবেশের জন্য প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। তারপর বিশব্যাপী প্রচার করা হয়েছিল যে, হায়দারাবাদে অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা নেই, সেখানে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। এমতাবস্থায় ভারত চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

দেরিতে হলেও বাংলাদেশের মানুষের মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করেছে। তারা স্বাধীনতা শব্দটি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এর প্রকৃত অবয়ব নির্মাণ করতে চাইছে। কে শত্রু, কে মিত্র চিহ্নিত করতে চাইছে।

"এক সাংবাদিক লিখেছেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল যে কারণে, সেই কারণগুলো হল ১। পাকিস্তান ভাঙ্গা, ২। বাংলাদেশকে ১৯৪৭ সালের পূর্বাবস্থার মত ভারতের অর্থনীতির পশ্চাদভূমিতে পরিণত করা। ৩। দক্ষিণ এশিয়ায় সার্বভৌম শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, বাংলাদেশকে আশ্রিত রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা। যুদ্ধ পূর্বকালীন অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে ৭ দফা এবং পরবর্তীতে ২৫ দফা বশ্যতা চুক্তি ভারতের সেই আচরণেরই সাক্ষ্য বহন করে।

তাছাড়া ১৯৭২ সালের পরবর্তী তিন বছর, ভারত বাংলাদেশের সাথে তার আশ্রিত রাজ্যের মতই আচরণ করেছিল।

বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান অনুমোদন করার জন্য তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনকে খসড়া বগলদাবা করে দিল্লী দৌড়াতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজ উদ্দিন আহমদকে ভারতের ডি পি ধরের দূয়ারে ধর্ণা দিতে হয়েছিল।

সেদিন ভারতেরই নির্দেশে নিয়মিত সেনাবাহিনী ধ্বংস করে ভারতীয় সেনার আদলে, ইউনিফর্মে বাংলাদেশকে সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল।

বেরুবাড়ী ভারতকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের মরণ ফাঁদ

www.nagorikpathagar.org

ফারাক্কা চালু করার অনুমতি দিতে হয়েছিল। দিল্লীর নির্দেশেই বাংলাদেশের সু-সংগঠিত মুদ্রামান ৬৬% হ্রাস করে দেশের সম্পদ ভারতে পাচার করে দিতে হয়েছিল। ভারতে কাঁচাপাট বিক্রীর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দেশের সমৃদ্ধ পাট শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছিল। দু'দেশে ফ্রি যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বর্ডার ট্রেড চালু করে চোরাচালান ব্যবসাকে অবারিত করা হয়েছিল। ভারতের অনুমতি ছাড়া একটা বন্দুক, এমন কি একটা বেসামরিক নৌযান কেনার অধিকারও বাংলাদেশের ছিল না।

এসব ঘটনা হায়দারাবাদ ট্রাজেডির পর শেষ নিজাম মীর ওসমান আলি খান এর অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁকে রাজপ্রমুখ আখ্যা দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাস্তবে তিনি নখদন্তহীন কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ৭২ পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারও তেমনি স্বাধীন নামধারি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের আশ্রিত রাজ্যের মত আচরণ করেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়েছিল সেই সরকারকে।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন দেশের আভ্যন্তরীন বিরোধ বা দাবী দাওয়াকে পুঁজি করে ভারত সেই দেশে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে। এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে সে দেশের স্বাধীনতা হরণ করে। যে মুসলিম শাসিত হায়দারাবাদে ৫০ বছর আগে থেকে সাম্প্রদায়িকতার কথা কেউ শোনেনি, সেই হায়দ্রবাদে হিন্দু মহাসভা, আর্য্য সমাজ প্রভৃতির শাখা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগানো হলো। বংশ পরম্পরায় প্রচলিত দেশের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নির্দেশে তাঁর শিষ্য রামানন্দ তীর্থ, নরসীমা রাও, ওয়াই বি চ্যবন এর মাধ্যমে 'বন্দে মাতরম' আন্দোলন শুরু করা হল। মোগল আমল থেকে প্রচলিত সমৃদ্ধ উর্দূ ভাষার পরিবর্তে হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলনের আন্দোলন শুরু করা হল। সর্বোপরি ষ্টেট কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট স্বামী রামানন্দ তীর্থের মাধ্যমে সশস্ত্র বিদ্রোহ সৃষ্টি করে হায়দারাবাদ সীমান্ত অঞ্চলকে ফ্রী জোন ঘোষণা করা, কম্যুনিষ্টদের হাতে অস্ত্রতুলে দিয়ে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ সৃষ্টি এসবই ছিল হায়দারাবাদ দখলের প্রস্তুতিমূলক ড্রেস রিহার্স্যাল। হায়দারাবাদেও বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবিদের মাধ্যমে দেশকে অশান্ত অস্থিতিশীল করে তোলা হয়েছিল। যার ফলে একদিন সামান্য আঘাতেই হায়দ্রাবাদের পতন ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

আজ বাংলাদেশের দিকে তাকালে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

আজ বাংলাদেশেরই কিছু বুদ্ধিজীবির মুখে উচ্চারিত হচ্ছে ৪৭-এর দেশ বিভাগ ভুল ছিল। তারা বলছেন- দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ছিল নাকি অন্যায়। তাহলে ভারতে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মারাঠা, গুর্খা, যাদের আচার-আচরণ, খাদ্য-পোষাক, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ভাষাগত কোন মিলই নাই, তারা কি ভাবে শুধু হিন্দুত্ববাদকে অবলম্বন করে এক জাতি হয়ে বাস করছে; সে কথা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিরা ভেবেও দেখে না। তারা একথাও মনে করে না, হায়দারাবাদে কম্যুনিষ্ট রাজ্য কায়েম করার জন্যই যদি তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের আগুন জ্বালানো হয়েছিল, তাহলে নিজামশাহীর পতনের পর, এবং ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখলের পর সে আগুন নিভে গেল কেন? সেখানে কম্যুনিষ্ট রাজ্য কায়েম হল না কেন?

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতের সাথে যে ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি করেছে, ভারতের মদদ পুষ্ট কতিপয় সশস্ত্র বিদ্রোহী চাকমার সাথে যে শান্তি চুক্তি করেছে। সে অসম বাণিজ্য চুক্তির ফলে দেশ ভারত নির্ভর হয়ে পড়ছে। এছাড়াও করিডোর চুক্তি, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার চুক্তি, ট্রানজিট চুক্তি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস চুক্তিসহ ভারতের সাথে যে যে চুক্তি করতে যাচ্ছে, সকল চুক্তি স্বাক্ষরের আগে তাদের হায়দারাবাদ, জুনাগড়, গোয়া, মানভাদর, সিকিম, কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটানের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে দেশটা নানান সংঘাতে, নানান বিপর্যয়ে রুগ্ন, জীর্ণ, ক্লিষ্ট হয়ে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে এমন কোন রাজনৈতিক ঝড় তোলা ঠিক হবে না, যার সামান্য আঘাতেই তাকে হায়দারাবাদের বা সিকিমের ভাগ্যবরণ করতে হয়। বহু দামে কেনা এই স্বাধীনতা। যাদের স্বাধীনতা নেই তারাই শুধু জানে কি তাদের নেই। কাশ্মীরবাসী বা প্যালেষ্টাইনীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, পরাধীন দেশে তাদের দিন কি ভাবে আসে রাত কি ভাবে যায়?

www.nagorikpathagar.org

৭ম নিযাম

সিকান্দার শাহ্ বাহাদুর
(রাজত্বকাল ১৮০৩-১৮২৯ খৃঃ)

সিকান্দার শাহ্ বাহাদুর
(রাজত্বকাল ১৮০৩-১৮২৯ খৃঃ)

এইচ এফ এম
মীর ওসমান আলী খান

মীর মাহবুব আলী খান বাহাদুর
(রাজত্বকাল ১৮৬৯-১৯১১ খৃঃ)

www.nagorikpathagar.org

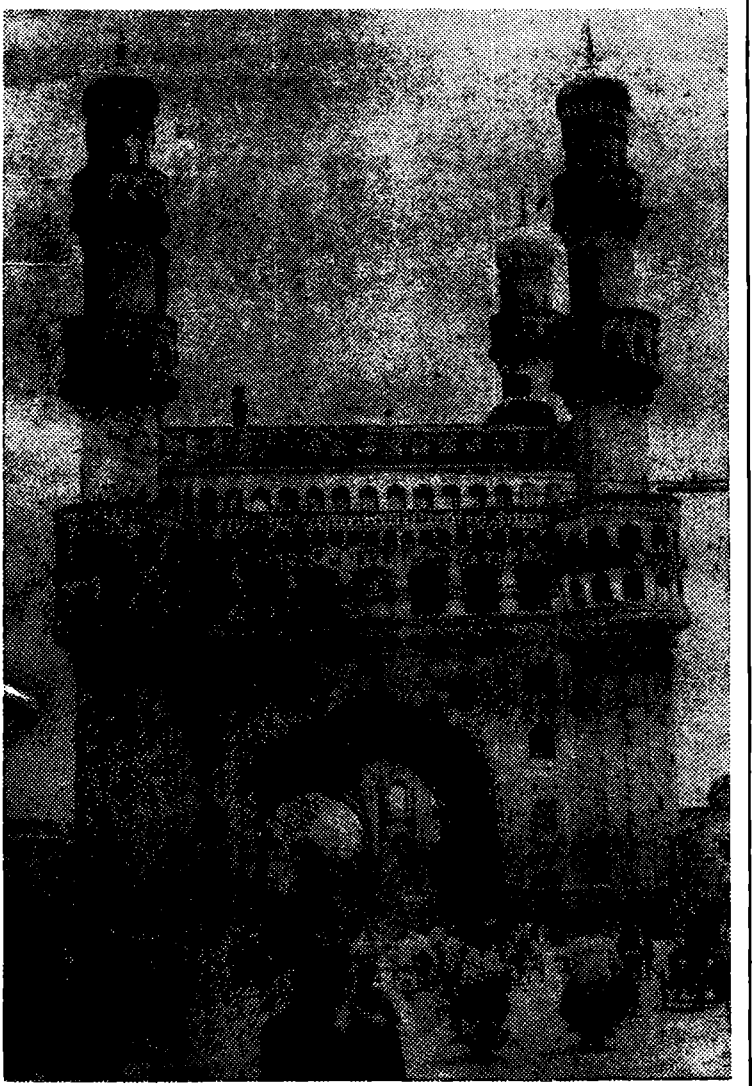

হায়দারাবাদের চার মিনার

www.nagorikpathagar.org

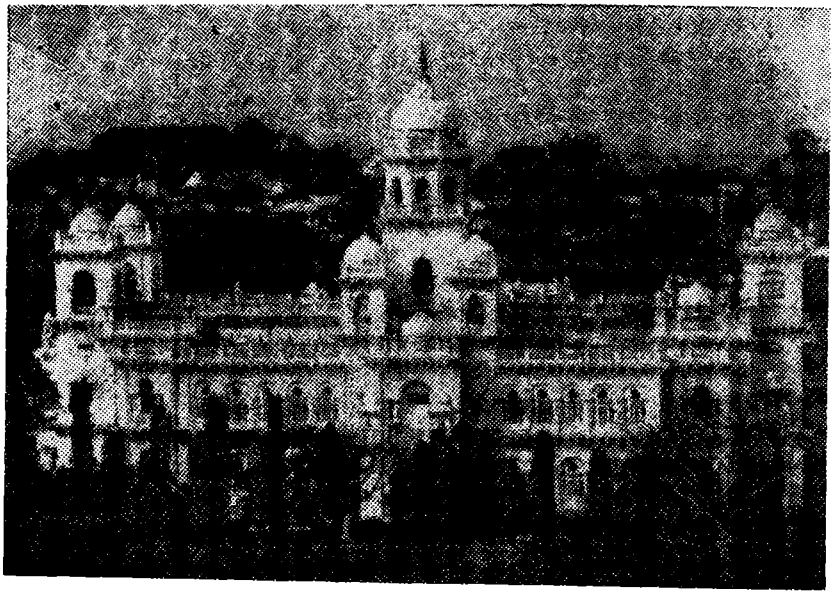

স্বাধীন হায়দরাবাদের জাতীয় সংসদ

স্বাধীন হায়দারাবাদের এক হাজার টাকার নোট

www.nagorikpathagar.org

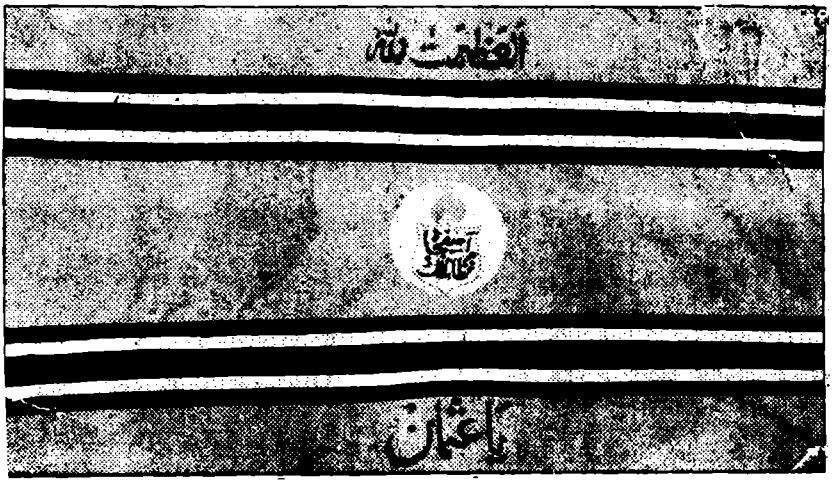

স্বাধীন হায়দারাবাদের পতাকা

স্বাধীন হায়দারাবাদের সৈন্য

www.nagorikpathagar.org

একটি রাজাকার (স্বেচ্ছাসেবক) দল। প্রথম সারির বাম দিক থেকে দ্বিতীয় কাশেম রিজভী

www.nagorikpathagar.org

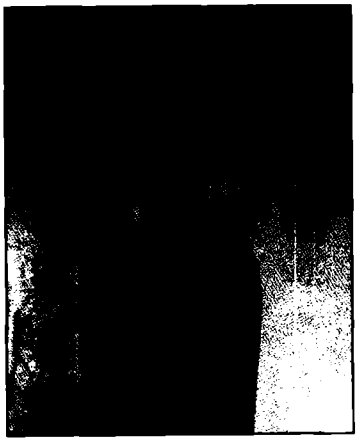

ভারতীয় হানাদার বাহিনীর প্রধান
জেনারেল জে.এন. চৌধুরী

১৯৪৮ সালের ২৯ নভেম্বর স্বাক্ষরিত (দলিল) চুক্তি এখনো অকার্যকর।

www.nagorikpathagar.org

আরিফুল হক দেশের বরেণ্য নাট্যশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। জন্ম ১৯৩৪-এর ১২ অক্টোবর হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলের মহাদেবপুর গ্রামে। মাতুলালয়ে। সাত বছর বয়সে নাট্যশিল্পে হাতে খড়ি। বাংলা নাট্য জগতের প্রবাদপুরুষ নামে পরিচিত শিশির কুমার ভাদুড়ীসহ বহু জনের সান্নিধ্যে নাট্যচর্চা করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (IPTA) সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর অভিনীত "উত্তরায়ণ" নামে প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি পায় কলকাতায় ১৯৫২ সালে। এ পর্যন্ত তাঁর অভিনীত প্রায় দু'শ চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। শিল্পী আরিফুল হক মঞ্চ, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিওসহ সকল মাধ্যমেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি একজন জনপ্রিয় প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট। দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক রোববার, বিক্রম, পালাবদল, প্রেক্ষণসহ বহু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তাশীল ও জাগরণমূলক প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।

নাট্য পরিচালক হিসাবেও তিনি দেশে-বিদেশে বহুল প্রশংসিত হয়েছেন।

নাট্য বিষয়ে তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৮১তে বাংলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম যে নাট্যদলটি দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বনাট্যোৎসবে যোগদান করেছিলেন, তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

আমেরিকান সরকারের অমন্ত্রণে সে দেশের নাট্যচর্চা প্রত্যক্ষ করার জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি দু'মাস ধরে আমেরিকার ১১টি অঙ্গরাজ্য সফর করেন। ঐ বছর বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার ও নাট্য বিষয়ক আলোচনা প্রচার করা হয়। একই কারণে তিনি ইংল্যান্ড, জাপান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভারতসহ বহু দেশ সফর করেন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা